মুসলিম বিশ্ব
সমসাময়িক
সমস্যা
ও চ্যালেঞ্জ

শাহ আবদুল হান্নান

মুসলিম বিশ্ব
সমসাময়িক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

শাহ আবদুল হান্নান

বুকমাস্টার

মুসলিম বিশ্ব ঃ সমসাময়িক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

শাহ্ আবদুল হান্নান

প্রকাশক
বুকমাস্টার
১০৭ নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০
ফোন : ০১৫৫৫-০২২৪৩৭

প্রকাশকাল
মে ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব
দি পাইওনিয়ার

প্রচ্ছদ
আমিনুল হক

মুদ্রণ
দি প্রিন্টমাস্টার

মূল্য
আশি টাকা

Muslim Biswa : Somosamoeik Somosya O Challange (Muslim World: Contemporary Problems and Challanges) by Shah Abdul Hannan. Published by Bookmaster 107 Nayapaltan, Dhaka 1000. First Publication: May 2016. Price: Tk.80.00 US$ 5.00

ভূমিকা

প্রায় চার দশক ধরে আমি যা লিখেছি সেখান থেকে সময়ের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ নয়টি প্রবন্ধের সংকলন এ বই। যারা মুসলিম বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ গভীরভাবে বুঝতে চান তাদের জন্য এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বের করণীয় ও লক্ষ্য কী হওয়া উচিত তা এ বইটি স্পষ্ট করবে।

বইটির পরিকল্পনা করে আমার প্রিয়ভাজন আহমদ হোসেন মানিক এবং মো. হাবিবুর রহমান। তারা মনে করে বর্তমান সংঘাতময় বিশ্বপরিস্থিতিতে বাঙলাভাষী পাঠকদের কাছে ইসলামী বিশ্বের জটিলতা, সংকট এবং তার উত্তরণে সঠিক ব্যাখ্যা ও কর্মসূচী নির্ধারণে বইটি পথ দেখাবে। আমিও তাদের সাথে একমত।

এ বইটির তথ্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠকের যে কোনো ধরনের পরামর্শ ও সংশোধনী আমাদেরকে কৃতার্থ করবে।

শাহ্ আবদুল হান্নান
shah_abdul_hannan@yahoo.com

মে ২০১৬

সূচিপত্র

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া // ৫
যে সংঘাতের সীমান্ত নেই // ৮
শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম ও সেকুলারিজম // ১২
মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সময়ের প্রধান ইস্যুসমূহ // ১৮
গণতন্ত্র ঃ প্রেক্ষিত ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব // ২৫
ইসলামে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতায়ন // ৩১
ইসলামী অর্থনীতি ঃ দর্শন ও কর্মকৌশল // ৩৬
পুঁজিবাদের অমানবিকতা ও ইসলামি অর্থনীতি // ৪৩
শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ গঠন // ৪৫

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া

দার্শনিকভাবে দেখলে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া, স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, 'ইয়া আইয়্যুহাল ইনসানু মা গার্‌রাকা বি রাব্বিকাল কারিম' অর্থাৎ 'হে, মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহিমান্বিত রব সম্পর্কে উদাসীন করল?' (কুরআন ৮২: ৬)।

সত্যিকার অর্থেই বেশির ভাগ মানুষ বাস্তবে স্রষ্টাকে ভুলে গিয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকায় নাস্তিকের সংখ্যা অনেক। রাশিয়া পূর্বে অফিসিয়ালি নাস্তিক ছিল। এখনো সেখানে নাস্তিকতার হার কম নয় বরং অনেক হবে। অন্যদিকে যারা বিশ্বাসী বলে দাবি করে তাদের মধ্যেও অনেকে সন্দেহবাদী (Skeptic)। অর্থাৎ বলবে না স্রষ্টা নেই কিন্তু বাস্তবে স্রষ্টাকে স্মরণ করবে না বা তাঁর আদেশ মেনে চলবে না। স্রষ্টাকে মেনে চলে, এ রকম লোকের সংখ্যা খুব কম।

খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে স্রষ্টার কার্যকর আনুগত্য কম। সে তুলনায় মুসলমানদের অবস্থা ভালো। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে নাস্তিক নেই বললেই চলে এবং যারা বিশ্বাসী তারা কোনো না কোনো পর্যায়ে আমল করেন। যারা নিজেদেরকে সেকুলার বলে দাবি করেন, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত আমল করেন। তারাও নামাজ পড়েন, ইফতার করেন, সেহেরি খান, হালাল-হারাম দেখে চলেন। তারাও কুরবানি, হজ, ওমরা ও ঈদ পালন করেন। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের অনুশীলন তুলনামূলক ভালো।

স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়ার ফলে দুটি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। একটি হলো বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা। আরেকটি হলো গোঁড়া সেকুলারিজম। সেটিও স্রষ্টাকে প্রায় অস্বীকার করার কাছাকাছি একটি অবস্থা। বিশ্ব সংকটের মূলে কাজ করছে এ দুটি– একদিকে বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা এবং অন্যদিকে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়ার প্রভাব শিক্ষাব্যবস্থার উপরও পড়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সেকুলারিজমের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান বিজ্ঞান শিক্ষাতে রয়েছে সেকুলারিজমের গভীর ছাপ। ইউরোপের পণ্ডিতরা এমনকি বর্তমানে মুসলমান বিজ্ঞানীরাও তাদের বইগুলো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' দিয়ে শুরু করেন না। কিন্তু মুসলমানরা যখন বিজ্ঞানে উন্নতি করল (চীন ও ভারত থেকে গ্রহণ করে), তখন তারা অনেক দিকে বিজ্ঞানের বিস্তার ঘটাল। সে সময় ঐসব মুসলমানরা তাদের বিজ্ঞানের প্রত্যেক বই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' দিয়ে শুরু করতেন। তারা স্রষ্টায় বিশ্বাসী ছিলেন গভীরভাবে। কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা বিশ্বাসী না হওয়ায় অথবা সেকুলার হওয়ায় কিংবা স্রষ্টায় বিশ্বাস করা তাদের কাছে একটি

লজ্জার বিষয় হওয়ায় তারা স্রষ্টার কথা উল্লেখ করেন না। আমাদের মুসলিম বিজ্ঞানীরা এটি এখন লিখতে পারেন; কিন্তু তারাও লিখছেন না। এখন না লেখা রেওয়াজ হয়ে গেছে। অথচ আগে লেখাটাই রীতি ছিল।

এখন বিজ্ঞানের বইগুলোতে আল্লাহ বা গড শব্দের উল্লেখ নেই। স্রষ্টা (Creator) শব্দটি লেখা হয় না। এটি একটি অদ্ভুত ব্যাপার। কোথাও কোথাও প্রকৃতি (Nature) শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই প্রকৃতি কী সেটি একেবারেই স্পষ্ট নয়। তারা একবারও ভাবেন না যে, এসব প্রাকৃতিক আইন আছে কীভাবে, আইনপ্রণেতা ছাড়া কি কোনো আইন হয়? তারা নাকি খুব যুক্তিবাদী, কিন্তু আমি তো কোনো যুক্তি দেখছি না।

আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক ভালো দিক আছে, অনেক অবদান আছে– তা আমরা মানি। কিন্তু এর পেছনে কাজ করছে এমন একটি মন যেটি স্রষ্টার প্রশ্নে, আল্লাহতায়ালার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়বাদিতায় ভুগছে, স্রষ্টাকে স্পষ্ট স্বীকৃতি দিচ্ছে না; আল্লাহর নাম উল্লেখ করছে না; এটি উল্লেখ করা সভ্যতাবিরোধী মনে করছে, এটি একটি পশ্চাৎপদ ব্যাপার মনে করছে। এই যে ধারণা এটি আমাদের কালচারকে খারাপ করে ফেলছে। আমাদের কালচারে সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার প্রভাব পড়ছে।

সমাজবিজ্ঞানেরও একই রকম অবস্থা। সমাজতত্ত্ব ধরেই নেয় যে ধর্ম একটি মানবসৃষ্ট বিষয়। অথচ সমাজবিজ্ঞানীরা এভাবে দেখাতে পারতেন যে, স্রষ্টাই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; আমাদেরকে একটি সামাজিক প্রবণতা বা সামাজিক মন দিয়েছেন। স্রষ্টার সার্বিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই আমাদের মধ্যে সমাজবদ্ধ হওয়ার মানসিকতা রয়েছে। এজন্য আমরা একতাবদ্ধ হই এবং সমাজ গঠন করি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য ডিসিপ্লিনেরও একই অবস্থা। যেমন– নৃবিজ্ঞানও স্বীকার করছে না যে, মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এটিকে বিজ্ঞানীরা একেবারেই বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। নৃবিজ্ঞান মানব সৃষ্টির ইতিহাস বের করার চেষ্টা করছে মাটি খুঁড়ে বের করা হাড় এবং অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক চিহ্ন থেকে। এসব থেকে তারা যে ইতিহাস লিখছে তাতে তারা বলছে, মানুষ এমনি এমনিই হয়েছে; কোনো স্রষ্টা নেই।

এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, দারিদ্র্য বিশ্বের একটি বড় সংকট, দারিদ্র্যের কারণে মানুষের একটি বিরাট অংশ ভালো হতে পারে না। এ সংকটের মূলেও রয়েছে আল্লাহকে না মানা, বস্তুবাদ এবং সেকুলারিজম। মানুষ বস্তুবাদী হয়ে গেছে। গরিবের জন্য, দারিদ্র্য দূর করার জন্য কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সে উপলব্ধি করছে না। অনেকেই দারিদ্র্য দূর করার জন্য ওয়াদা করে থাকেন। আসলে তারা ওয়াদা করার জন্য ওয়াদা করেন, কথা বলার জন্য বলেন। সত্যিই কি কার্যকরভাবে তারা এগুলো চান? বিশেষ করে দেশের পুঁজিবাদীরা এগুলো চান না বলেই মনে হয়। কারণ পুঁজিবাদের তত্ত্বে গরিবের কথা নেই– প্রফিটের কথা আছে, মুক্তবাজারের কথা আছে। সেখানে সরকারি হস্তক্ষেপ না করার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়ার মাধ্যমে বাজারের বিকৃতি (Market Distortion) দূর করার কথা পুঁজিবাদী

তত্ত্বের কোথাও নেই। গরিবের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে– এটি পুঁজিবাদের কোথাও বলা নেই। যদিও এটি এখন পুঁজিবাদী দেশে করা হচ্ছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা তারা নিচ্ছেন পুঁজিবাদের কাঠামো থেকে বের হয়ে এসেই। উপনিবেশবাদ (Colonialism) এবং সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)-ও এসেছে বস্তুবাদ থেকেই। নিজের ভোগ ও জাতির ভোগের প্রেরণা থেকেই এসবের উৎপত্তি। এ সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে শোষণ (Exploit) করা। এই যে বস্তুবাদী স্বার্থপরতা এবং পুঁজিবাদ– এসব পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। এ সবকিছু মিলে মানুষকে দায়িত্বহীন বানিয়েছে, তাকে ভোগবাদী করে তুলেছে। দায়িত্বশীল কাদেরকে বলা যেতে পারে? যারা আল্লাহকে ভয় করেন এবং দুনিয়াকে শোষণ করেন না।

সুতরাং সকল সমস্যার মূল কারণ যদি বলতে হয় তাহলে আমি বলব, স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া। এজন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলরা আহ্বান করেছেন আল্লাহকে মানো এবং বলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

এ সমস্যার সমাধান হচ্ছে মানুষের মধ্যে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। মুসলিমদের এমনকি অমুসলিমদের জন্যও বলব, যেকোনো ধর্মের প্রতি বিশ্বাস নাস্তিকতা থেকে ভালো। প্রত্যেক ধর্মের একটি এথিক্স বা নীতিবোধ আছে। নাস্তিকতার কোনো নীতিবোধ নেই। এটি তো নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। নাস্তিক বিশ্বাস করে যে তার কোনো বিচার হবে না, তার কোনো জবাবদিহিতা নেই; সুতরাং দুনিয়ায় যা ইচ্ছা সে করতে পারে। এ ধরনের লোক সমাজের জন্য ভয়ঙ্কর। এজন্য সবার মধ্যে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। আল্লাহকে চেনাতে হবে যতদূর সম্ভব। সঠিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবেই সমাজ তথা বিশ্ব থেকে স্বার্থপরতা দূর হতে পারে, সমাজের মূল রোগ তথা মূল সমস্যা দূর হতে পারে।

যে সংঘাতের সীমান্ত নেই

আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বব্যাপী একটি সংঘাত চলছে। এ সংঘাত পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ইসলামি সভ্যতার। এ সংঘাত সম্পর্কে আমরা ঠিক সচেতন ছিলাম না। এ কথা ঠিক যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং ইসলামী সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। নানা পর্যায়ে, বিশ্বাসে, জীবনব্যবস্থায় দ্বন্দ্ব বা পার্থক্য ছিল এবং নানা ধরনের সংঘাতও হয়েছে। মুসলিম শাসকগণ অনেক খ্রিস্টান দেশ দখল করেছেন। ইতিহাসে দেখা যায় তারা ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর দখল করেছিলেন। এসব দেশে খ্রিস্টান ও ইহুদি জনগোষ্ঠী ছিল। পরবর্তীতে তুর্কি খিলাফত পূর্ব ইউরোপের অনেক অংশ দখল করেছেন।

এদিকে ক্রুসেডের সময় আমরা দেখেছি, তারা মিসরের একটি অংশ, ফিলিস্তিনের একটি অংশ এবং সিরিয়া দখল করেছেন। পরবর্তীতে ইউরোপীয় বা খ্রিস্টান শাসকগণ গোটা বিশ্বকে দখল করেছেন। তারা গোটা এশিয়া ও আফ্রিকা দখল করে নিয়েছেন, যার অধিকাংশই মুসলিম দেশ ছিল। সুতরাং একটি পার্থক্য, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সব সময়েই ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোনো তত্ত্ব খাড়া করানো হয় নি যে– দুটোর মধ্যে একটি সংঘাত আছে। হতে পারে তা অস্পষ্ট ছিল বা স্পষ্টকরণ করা হয় নি। তবে পরিস্থিতি সবসময় যে সংঘাতের ছিল তা নয়, অনেক সময় এটি ছিল পারস্পরিক প্রতিযোগিতার। পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কও ছিল বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু এটিকে একটি সার্বিক ও সংঘাতের রূপ হিসেবে স্যামুয়েল ফিলিপস হান্টিংটন (১৯২৭-২০০৮) উপস্থাপন করেন তার 'দি ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস অ্যান্ড দি রিমেকিং অব ওয়ার্ল্ড অর্ডার' বইয়ের তত্ত্বে। হান্টিংটনের এ তত্ত্ব মানুষকে নতুনভাবে দ্বন্দ্বের মধ্যে নিয়ে গেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা কোনোটিই তো এক রূপ নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতারও ভ্যারিয়েশন আছে; তবে গুণগতভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সার্বিক একটি সাযুজ্য আছে। সেটি অনেকটা বস্তুবাদ ও সেকুলারিজম। এতে সামাজিক জীবন স্রষ্টার নির্দেশনার অধীন হবে না; রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি ধর্মীয় নীতির অধীন হবে না। এ ধরনের সেকুলারিজম ও আধুনিক সভ্যতা দুনিয়ার বুকে একটি বস্তুবাদের রূপ ধারণ করেছে। বেশি উপার্জন, বেশি ভোগ, বেশি এনজয়মেন্ট এ সভ্যতার পেছনে কাজ করছে। এ কথা আলাদা যে তারা ভালোও অনেক কিছু করে থাকে। তা সত্ত্বেও বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার পেছনে সার্বিকভাবে একটি ঐক্য আছে। অন্যদিকে ইসলামি সভ্যতার মধ্যেও কিছু পার্থক্য আছে। তা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে এর মধ্যে একটি ঐক্য রয়েছে তা ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, মরক্কো বা তুরস্ক যাই

হোক না কেন; তাদের বিশ্বাস মূলত একই রকমের; তাদের কালচারে বিরাট সামঞ্জস্য রয়েছে; তাদের প্রীতিবোধ এক ধরনের; তারা কুরআন-সুন্নাহকে অনুসরণ করে।

এখন সংঘাতের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করছি। এ সংঘাত এমন যে যার কোনো সীমান্ত খুঁজে পাই না। কারণ হচ্ছে এ দুই সভ্যতার সংঘাত এখন চলছে প্রতিটি গ্রামে, পাড়ায়, মহল্লায়, শহরে। এমনিভাবে প্রতিটি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সেখানে একদিকে রয়েছে পাশ্চাত্য কালচারের নানাবিধ চর্চা, যার মাধ্যমে আমরা পাশ্চাত্যের কালচারকে গ্রহণ করি এবং এর ফলে আমাদের বিনোদনও তাদের মতো হয়ে যায়; আমাদের সিনেমা তাদের মতো হয়ে যায়; আমাদের মিডিয়া তাদের মতো হয়ে যায়; আমাদের নাটক ও সাহিত্য যৌনতাভিত্তিক হয়ে যায়। এ কালচারের সংঘাত আজ টেলিভিশনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। তারা এটিকে ঢোকাতে চেষ্টা করছে আর আমরা এটিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি। শুধু প্রতিরোধই করছি না, যেসব মুসলিম এখন ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তারা আবার পাশ্চাত্য কালচারের ভেতরেই সেখানেও ইসলামি কালচারে সুপিরিয়র। আমাদের পরিবার শক্তিশালী। আমরা পিতা-মাতাকে সম্মান দিই এবং বাচ্চাদের প্রতি বেশি বেশি খেয়াল করি। আমাদের মধ্যে অবৈধ যৌনতা অপছন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ। আমরা পরিবার ব্যবস্থা রক্ষা করি। পাশ্চাত্যও নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতা কিছুটা চাপের মধ্যে পড়ছে। তারা এসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন। শুধু আমরাই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তা নয়, তারাও এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছেন। এটি সত্য যে, পাশ্চাত্যের অনেকেই ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল। অনেকে ইসলাম গ্রহণও করছেন। এটিকেও একটা চ্যালেঞ্জ বলে তারা মনে করেন। তাই তারা রাজনৈতিকভাবে মুসলিম বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বকে ডমিনেট করার চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকে তারা বেশি ডমিনেট করার চেষ্টা করছেন। তারা নানাভাবে তাদের পক্ষের লোক সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। ইন্টেলেকচুয়ালদেরকে তাদের পক্ষে নেয়ার জন্য তারা নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা চেষ্টা করছেন তাদের প্রাধান্য ধরে রাখতে। বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার সম্পদ লুট করে তারা তাদের অর্থনীতিকে গড়ে তুলেছেন। গত দু শ' বছরে তারা এসব অপহরণ করেছেন। এখন তারা ঐ প্রাধান্য বজায় রাখতে চান। এর মাধ্যমে তারা বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকে গ্লোবালাইজেশনের নামে একটি অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংঘাত আছে। তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়া সামাজিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। তারা বলছেন, ক্যাপিটালিজম শ্রেষ্ঠ। এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে মোটেই তারা বলছেন না। ক্যাপিটালিজমের থিওরির মধ্যে যে গরিবের সমস্যার কোনো উল্লেখ নেই এবং এর যে কোনো সমাধান নেই, এসব তারা বলছেন না। তারা ক্যাপিটালিজমকে সুপিরিয়র করার

চেষ্টা করছেন, কিন্তু আসলে এটা তো সুপিরিয়র নয়। এর মধ্যে অনেক সমস্যা রয়েছে; বাজারব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনেক ব্যর্থতা রয়েছে। যেমন- দুঃখি লোকের কোনো কথাই ক্যাপিটালিজমে নেই। এটি একটি অমানবিক সুবিচার অস্বীকারকারী ব্যবস্থা। সমাজবিজ্ঞানে যা পড়ানো হচ্ছে তাতে স্রষ্টার কোনো স্থানই নেই। এতে ধরেই নেয়া হচ্ছে ধর্ম মানুষের সৃষ্টি। অথচ দেখানো যেতে পারতো যে, স্রষ্টা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমরা এই সমাজ তৈরি করেছি। স্রষ্টা নিজেই তো মানুষের স্বভাবের মধ্যে সমাজবদ্ধতা রেখেছেন। কাউকে তিনি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হিসেবে সৃষ্টি করেন নি। সবাইকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে আমরা সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে বাধ্য; পরিবার গঠন করতে বাধ্য; আমরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় তা না করে এটিকে একটি মানবসৃষ্ট বিষয় হিসেবেই দেখানো হচ্ছে। এ সংঘাত মূলত মুসলিম সভ্যতা, ইসলামী সভ্যতার সাথে বিশেষ করে সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে, মূল্যবোধের ক্ষেত্রে।

এটিকে যদি আমাদের প্রতিরোধ করতে হয়, উল্টিয়ে দিতে হয়, এ সংগ্রামে যদি আমাদেরকে জিততে হয় তাহলে এর জন্য আমাদের অসংখ্য যোগ্য লোক লাগবে। এ সংঘাত মোকাবেলার জন্য নেতা লাগবে, কর্মী লাগবে। কিন্তু কোথায় লাগবে? এর উত্তর হলো, সব জায়গায় লাগবে, কেন না এ সংঘাতের কোনো নির্দিষ্ট সীমান্ত নেই। প্রত্যেক পাড়ায় লাগবে, কেন না প্রত্যেক পাড়ায় তাদের সাপোর্টার তৈরি হয়ে আছে। সুতরাং যারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামি সভ্যতা ও কালচারের জন্য কাজ করতে চান, যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার সব কিছুকে অবাধে মানতে চান না বা যারা মুসলিম সভ্যতার প্রাণকে রক্ষা করতে চান, তৌহিদকে রক্ষা করতে চান (অর্থাৎ সব কিছুর ভিত্তি হতে হবে স্রষ্টার স্বীকৃতি, স্রষ্টা আছেন এটিকে বাদ দেয়া বা এড়িয়ে যাওয়া যাবে না) তাদের অবশ্যই যোগ্য নেতা লাগবে, কর্মীও লাগবে। প্রত্যেক গ্রামে, পাড়ায়, প্রাইমারি স্কুলে, কলেজে, মহল্লায়, সংবাদপত্রে, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার জগতে অসংখ্য এবং যোগ্য নেতা লাগবে যারা এ সংঘাতকে মোকাবেলা করতে সক্ষম। এর মানে, ইসলামি সংগঠনের সকল কর্মীকে স্ব স্ব স্থানে কর্মী ও নেতা হতে হবে। যেমন বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামে অন্তত আটষট্টি হাজার নেতা লাগবে। শহরে যদি বিশ-ত্রিশ হাজার পাড়া থাকে তাহলে শহরের জন্য বিশ-ত্রিশ হাজার নেতা লাগবে। এটি সহজ বিষয় নয়। লেখালেখির ক্ষেত্রেও লাগবে। সুতরাং এর জন্য অসংখ্য কর্মী ও অসংখ্য নেতা দরকার। বিষয়টি আমাদেরকে বুঝতে হবে।

আমরা যারা ইসলামের জন্য কাজ করি, ইসলামি সভ্যতার জন্য কাজ করি তাদেরকে ভাবতে হবে যে আমরা আমাদের সময়ের কতটুকু এই কাজে ব্যয় করছি। আমরা যদি বিভিন্ন পেশাজীবীর দিকে তাকাই তাহলে দেখবো, তারা দিনের ১২/১৪ ঘন্টা রোজগারের পেছনে দৌড়াচ্ছেন, এরপর আর তাদের সময় থাকে না। তারা তাদের প্রয়োজনকে বাড়িয়ে নিয়েছেন। গোপন বস্তুবাদ অনেককে গ্রাস করেছে। এর পরিবর্তন চাইলে তিনি পড়াশোনায় সময় দিতে পারতেন; নিজের যোগ্যতাকে বাড়াতে পারতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা করা হচ্ছে না। যদি

ব্যবসায়ীদের দিকে দেখি, তারা শুধু আট ঘণ্টাই নয়, বেশির ভাগ সময়ই ব্যবসায়ের পেছনে দিচ্ছেন। তার তো আর সময় নেই। তাহলে আল্লাহতায়ালা তাকে যে মূল জিনিস দিয়েছেন তার জীবন (জীবন মানে সময়)– এ জীবনের সবটাই তো তিনি তার ব্যবসায়ের পেছনে দিয়ে দিলেন। আর সেখানে তিনি যে সম্পদ অর্জন করেছেন তার সামান্যই হয়তো আল্লাহর পথে ব্যয় করছেন। কিন্তু তিনি তো তার সময় নামক যে জীবন সেখান থেকে কিছুই বা তেমন কিছুই দিচ্ছেন না। আইডিয়াল হবে যদি আমি আট ঘণ্টা ব্যবসায় পেশায় ব্যয় করি এবং ন্যূনতম পাঁচ-ছয় ঘণ্টা বিনিময় ছাড়া মানবসেবায়, জাতির সেবায়, সমাজ সেবায়, দুঃখির সেবায়, ইসলামের সেবায় নিয়োগ করতে পারি।

এই যে অবস্থা, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামি সভ্যতার মধ্যে যে সংঘাত এর কোনো সীমান্ত নেই। কোনো এক জায়গায় লোক পাঠিয়ে দিলাম তাতে হবে না। কোনো বর্ডার এখানে দেখা যায় না। এটি একটি বর্ডারলেস যুদ্ধ বা সংঘাত। এখানে আমাদের অসংখ্য কর্মী লাগবে; কাজ করা লাগবে। কাজের জন্য এটি একটি ভালো নির্দেশক যে কতটা সময় আমি ব্যয় করছি পয়সার বিনিময়ে এবং কতটুকু কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া মানবতার জন্য ব্যয় করছি; সমাজ, জাতি, ইসলামের জন্য ব্যয় করছি; দুঃখি ও অসহায়দের পেছনে ব্যয় করছি। এ বিষয়গুলো ইসলাম ও ইসলামি সংগঠনের নেতা, কর্মী, আলেম, ছাত্রকর্মী সবাইকে অনুসরণ করতে হবে বলে আমি মনে করি।

শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম ও সেকুলারিজম

বিশ্বের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রত্যেকটি Cell-এর যেমন একটি Nucleus থাকে, তেমনিভাবে একটি আদর্শ হিসেবে সেকুলারিজমের উত্থানের আগে পর্যন্ত সভ্যতা, শিক্ষার Nucleus বা কেন্দ্র ছিল ধর্ম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নাস্তিকতা ইতিহাসে কোনো সভ্যতার ভিত্তি ছিল না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল একটি নৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি করা, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করা। এ কথা ইসলামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইসলামি যুগের শুরুতে, মধ্যযুগে এবং অতি সাম্প্রতিককালেও ঔপনিবেশিক যুগের আগে পর্যন্ত মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ছিল কুরআন, হাদিস ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের ওপর বা ফিকাহর ওপর। মোটকথা, এর সবগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়ার সাথে সাথে ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্র পরিচালকদের কর্তব্য, সরকারি নীতিমালা অথবা শাসনকার্যের নিয়মকানুন নিয়ে আলোচনা করা ও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। হজরত আলী (রা.) কর্তৃক মালিক আল মুশতারকে পাঠানো চিঠিতে গভর্নর বা রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব কী সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। এর দ্বারা শুধু এ কথা প্রমাণ হয় যে, শিক্ষার মর্মমূলে ছিল ধর্ম বা ইসলাম, তথা চরিত্র ও নৈতিকতা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞান যা-ই শিক্ষা দেয়া হতো, তা ছিল এ মূলকে কেন্দ্র করে।

বৌদ্ধদের ইতিহাসেও দেখা যায় একই সত্যের পুনরাবৃত্তি। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদান করা হতো, তারও মধ্যে দেখা যায়, শিক্ষাব্যবস্থার মূলে ছিল চরিত্র বা বৌদ্ধ ধর্মের নৈতিকতা। এর সাথে তারা ভারতে প্রচলিত অন্যান্য বিদ্যাকেও শামিল করে নিয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রাথমিক যুগের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিদ্যা শিক্ষার মূল ছিল বেদ। 'বেদ' মানেই বিদ্যা। তাদের প্রাচীন ফিলসফির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বেদ। অর্থাৎ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এই বেদই। এর সাথে যুদ্ধবিদ্যা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা অর্থনীতি ও অন্যান্য শাস্ত্রও যোগ করা হয়েছিল প্রয়োজনকে সামনে রেখে।

খ্রিস্টানদের অতীতে গেলেও দেখা যায়, তাদের শিক্ষাও ছিল গির্জাকে কেন্দ্র করে। প্রত্যেকটি গির্জা একটি কলেজ বা শিক্ষালয় ছিল। সেখানে যা পড়ানো হতো, তার মূল ভিত্তি ছিল বাইবেল তথা Old Testament ও New Testament। এ থেকে একটি কথাই প্রমাণিত হয় যে, ১৮০০ শতাব্দীর শেষভাগে যখন Enlightenment শুরু হলো এবং যার 'সন্তান' হিসেবে Secularism-এর উদ্ভব হলো– তার আগে পর্যন্ত শিক্ষা ওই রকমই ছিল। তার ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, বিভিন্ন বিদ্যার ক্ষেত্রে জানার পরিমাণ কমবেশি থাকলেও মানুষ নৈতিক দৃষ্টিতে ভালো ছিল। বেশির ভাগ

মানুষ, তিনি হিন্দু হোন, বৌদ্ধ হোন– মানুষ হিসেবে দানশীল ছিলেন। অন্তত মানবিক গুণাবলীর দৃষ্টিতে তারা আজকের চেয়ে ভালো মানুষ ছিলেন। অমানুষ ছিলেন না।

আঠারো শতকের শেষে যে পরিবর্তন বা যে মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন হলো তার আগে ইউরোপে দু'টি আন্দোলন হয়েছিল। প্রথমটি রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ। এটি ছিল আর্ট ও লিটারেচারের ক্ষেত্রে; ধর্ম বা রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়। এর পরেরটি হচ্ছে Reformation Movement যার মানে হলো, খ্রিস্টান চার্চের মধ্যে থেকেই আপত্তি উঠলো যে, পোপই কি বাইবেলের একমাত্র ব্যাখ্যাতা? এর কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে বলতে চাই যে, এরই ফলে চার্চ নানাভাবে বিভক্ত হলো, যেমন– লুথারের নেতৃত্বে Lutherian Church, Kelvin এর নেতৃত্বে Kelvinist Church, British Priest-দের নেতৃত্বে Anglican Church, Baptist Church ও অন্যান্য। এর সবগুলোকে একত্রে বলা হয়ে থাকে Protestant Movement, যেটা হলো Reformation এর ফল। তৃতীয় যে আন্দোলন হলো সেটি হয়েছিল ফ্রান্সে। সেটি শুরু হয় মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের নামে। আঠারো শতকের শেষে এবং ফরাসি বিপ্লবের আগে ও পরে এর প্রভাব বজায় রইল। যেকোনো কারণেই হোক, এই আন্দোলনের বেশিরভাগ নেতারা ছিলেন নাস্তিক বা গুপ্ত নাস্তিক কিংবা নাস্তিকের মতো। মানব ইতিহাসে এই প্রথম এরা এ দর্শন নিয়ে এলেন যে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাজ থেকে ধর্মকে বিদায় করতে হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ব্যাপারে ধর্মের কোনো ভূমিকা থাকবে না। ধর্ম থাকতে হলে কারো অন্তরে থাকবে, যদি কেউ রাখতে চায়। অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি, আইনসভা এসব থেকে ধর্মকে দূরে রাখতে হবে। এ আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল ওহি নয়, যুক্তিই জীবনের ভিত্তি হবে এবং আল্লাহর শাসন কায়েম হবে না। যে কারণেই হোক, এই আন্দোলন ইউরোপের তৎকালীন নেতৃত্বকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। এটি মোটামুটি গৃহীত হয়ে যায় এবং ক্যাথলিক বা প্রটেস্টান্ট চার্চ এটাকে বাধা দিয়ে কুলাতে পারে নি। এর ফল হয় ভয়াবহ, যা এখন আলোচনা করবো।

প্রথম কুফল হলো এই– শিক্ষা থেকে ধর্মকে আলাদা করা হলো। এভাবে যে স্কুল ব্যবস্থা গড়ে উঠল তাতে মানুষ নিতান্ত স্বার্থপর হয়ে গড়ে উঠল। তারা ভোগবাদী হয়ে পড়ল। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে গেল। যে ধর্মের দ্বারা কোনো কাজ হয় না, তার প্রতি সম্মানও কমে গেল। নীতিবোধের যে শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য তাও লোপ পেল। নীতিহীনতা, স্বার্থপরতা নিয়ে মানুষ গড়ে উঠল। এই স্কুলে জেনারেলরা গড়ে উঠলেন, পলিটিশিয়ান ও চিন্তাবিদরা তৈরি হলেন। তাদের মনের গভীরে এই মনোভাব স্থায়ী হলো যে, জনসমাজের জন্য ধর্মের প্রয়োজন নেই, চাই সেটা পার্লামেন্ট, মার্কেট, স্টক এক্সচেঞ্জ, ব্যাংক, যা-ই হোক না কেন। এই যে ব্যক্তিগত এক ধরনের মনমানসিকতা গড়ে উঠল তার ভিত্তিতে তাদের সামাজিক আচরণ তৈরি হলো।

এর ফলে সব ক্ষেত্রে তার প্রভাব কার্যকর হলো। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সোশ্যাল ডারউইনিজম প্রবেশ করল অর্থাৎ 'Survival of the Fittest'-কে মূলমন্ত্র করে নেয়া হলো। 'কেবল যোগ্যতমই টিকে থাকবে' এর মানে– যারা যোগ্যতম নয়, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক, কিছু আসে যায় না। প্রাকৃতিক ক্রিয়াকে আমরা বাধা দেবো কেন? এভাবেই কোনো জাতি যদি এ উপমহাদেশের লোক হয়ে বা আফ্রিকা বা চীনের লোক হয়ে প্রতিযোগিতায় যোগ্যতম প্রমাণিত না হয় বা টিকতে না পারে, তারা হেরে যাবে। এখানে কোনো নীতিবোধ, দয়ামায়ার প্রয়োজন নেই। এটাই বরং যুক্তিযুক্ত যে, যোগ্যতমকে আমরা এগিয়ে দিলাম। এটাই ছিল সোশ্যাল ডারউইনিজম, যা ছিল খ্রিস্টান ধর্মের বিরোধী, ইসলামের বিরোধী। খ্রিস্টান ধর্ম বলেছে তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো, বলেছিল চ্যারিটির কথা। আর ইসলাম 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে ব্যয়, জাকাতের কথা বলেছে। এটি একটি বড় ব্যাপার। নিকটাত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ববোধ একটি বড় ব্যাপার। সেকুলারিজম বা মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন অর্থনীতির ক্ষেত্রে গডকে বাদ দিয়ে চিন্তা করার রীতি চালু করল। যে পুঁজিবাদ চালু হয়েছে ৫০০ বছর আগে, তাও বাস্তবে এত নীতিহীন ছিল না। খ্রিস্টান নীতিবোধ তার ক্রিয়াকে 'মডারেট' করত। অবশ্য তারা সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা ভিত্তিক মার্কেট চালু করেছিল। মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের আগ পর্যন্ত পুঁজিবাদের সেই ভয়াবহ চিত্র তৈরি হয় নি।

কিন্তু পুঁজিবাদ যখন সেকুলারিজমের (যার প্রকৃত অর্থ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মবর্জনবাদ) সঙ্গী হলো, তখন ইউরোপে শ্রমিককে এমনভাবে শোষণ করা হলো, তাদের শুধু বেঁচে থাকার অবস্থায় রেখে দেয়া হলো; তাও শুধু উৎপাদনের স্বার্থে। পরে এর প্রতিক্রিয়াতেই কমিউনিজমের জন্ম হলো– সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হলো। অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধির মতবাদ বা সেকুলারিজম আরোপের ফল হলো এই, অর্থনীতির ক্ষেত্রে অমানবিকতা ও নীতিহীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং বলা হলো, এটা হচ্ছে পজিটিভ সাইন্স; অর্থনীতি একটি অবমিশ্র বিজ্ঞান; এর মধ্যে নীতিবোধ থাকবে না, নীতি থাকবে না। যেমনভাবে বাতাস বা পানির জন্য আমরা কোনো নীতি দেই না, তেমনি অর্থনীতির কোনো নীতি থাকবে না। এটি নিজের গতিতে চলবে। এগুলোর পরিণাম অর্থনৈতিক সঙ্কট। এটি হয়েছে অতি লোভ ও অতি লোভের আকাঙ্ক্ষা থেকে এবং রিবা (সুদ) তাকে সাহায্য করেছে। সুদ না থাকলে এটি কখনোই হতো না।

আমি এ পর্যন্ত মুক্তবুদ্ধি আন্দোলন ও সেকুলার আন্দোলনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছি। এর অন্য ফল হলো– মানুষ মুখে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ভ্রাতৃত্বের কথা বলল; কিন্তু একই সাথে সেকুলার শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তানরা দুনিয়া বিজয়ে বের হয়ে গেল। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, হল্যান্ড প্রায় সারা দুনিয়া দখল করে নিল। দুই আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আফ্রিকার প্রায় ১০০ শতাংশ এবং এশিয়ার প্রায় ৭০ শতাংশ দখল হলো। তা করতে গিয়ে এরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলো এবং ওই সব দেশের স্থানীয়দের সাথে পর্যন্ত যুদ্ধ করল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মুক্তবুদ্ধির অনুসারীরা সারা দুনিয়া জয় করল। তাদের নীতিহীনতা এই জয় এনে দিলো। কেন না, কোনো নীতিবাদী সমাজ এভাবে পররাজ্য আক্রমণ করতে পারে না, দখল করতে পারে না। তারা লুট করল বিশ্বকে। আফ্রিকার মতো একটি সমৃদ্ধ মহাদেশকে তারা বিরান করে ফেলল। লোহাসহ নানা ধরনের খনিজসম্পদ, স্বর্ণ, হীরা– সবকিছুই তারা লুট করে নিলো। দক্ষিণ আমেরিকাকে স্পেনীয়রা লুট করল। ব্রিটিশরা আমাদের বাংলাকে লুট করল, যেমন আফ্রিকাকে করা হয়েছে। লুটতরাজ ছিল তাদের আসল কাজ। তার মানে হচ্ছে, সেকুলারিজম ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরি হওয়া লোকেরা মানুষকে চরমভাবে শোষণ করল। তার পর তারা বলল, আমরা তাদের Civilise করেছি। যারা নিজেরা Uncivilised তারা অন্যকে কিভাবে Civilise করবে? তারা যখন বণিক হিসেবে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে এসেছিল, তখন মুঘল সম্রাটের যে Culture, যে Refinement, যে Etiquette ছিল, তার ধারে কাছেও এ বণিকরা ছিল না। যাহোক, আমি বলি, তাদের রাজনৈতিক আচরণটাই ছিল নীতিহীনতা। তারা পরস্পর মারামারি করল। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ভারতের দখল নিতে চেষ্টা করল। শেষে ইংল্যান্ড একাই অঞ্চলটা দখল করল। অনুরূপভাবে আমেরিকায় ফ্রান্স, ব্রিটেন ও স্পেনীয়রা লড়াই করল। অবশেষে দক্ষিণ আমেরিকা স্পেনের আওতায় গেল। উত্তর আমেরিকা গেল ব্রিটিশ আওতায়। আফ্রিকাতে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি ও পর্তুগাল লড়াই করল। পর্তুগাল মোজাম্বিক এলাকা নিলো। ডাচরা সাউথ আফ্রিকাসহ কিছু এলাকা নিয়ে গেল। মাগরেব বা উত্তর আফ্রিকা নিলো ইতালি ও ফ্রান্স। ওমর মোখতারের ফিল্মে এর কাহিনী রয়েছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, ধর্মকে বাদ দিয়ে যে মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন করা হলো তার মাধ্যমে কী ধরনের লোক তৈরি হলো। তারা দুনিয়া দখল করে বেড়াল। লুটতরাজ করল। নিজেদের মধ্যে লড়াই করল। কিন্তু শান্তি আনল না। এর ফল হলো, তারা দুনিয়াকে শান্তি দিতে পারল না। তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ করল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ করল। পাশ্চাত্য সভ্যতার গর্ভ থেকে চারটি অত্যন্ত ক্ষতিকর মতবাদের জন্ম হয়েছে– ফ্যাসিজম, কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম ও সেকুলারিজম। কেবল ডেমোক্র্যাসি ছাড়া তারা ভালো কিছু করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

স্রষ্টাকে যারা কোনো স্থান দিতে রাজি নয়, তারা পরিবার ও জেন্ডার ইস্যুতে পশুর মতো হয়ে গেল। তারা মনে করল, পরিবারের গুরুত্ব নেই। এটি হলো নারীদের দাবিয়ে রাখার একটি প্রতিষ্ঠান তাদের দাস বানানোর জন্য। তারা বরং পশুর মতো থাকাই ভালো মনে করল। পরিবার করার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর যদি কেউ পরিবার গঠন করেও, তবে এটি হবে সন্তান জন্মদানের জন্য। তা পশুর মতোই হবে। এমনও হতে পারে, একটি কমিউন হবে। সে কমিউনে ১০০ জন পুরুষ ও ১০০ জন নারী থাকবে। কার শিশু কেউ জানবে না। সবাই মিলে শিশুদের পালবে। তারা এমন একটি ধারণাও নিয়ে এলো যে, তত দিন পর্যন্ত একটি পশু তার বাচ্চা পালে, যত দিন পর্যন্ত নিজের খাবারটা নিজে খেতে না পারে। তত দিন পর্যন্ত বাঘও পালে, কুকুরও পালন করে যত দিন পর্যন্ত বাচ্চা নিজের পায়ে দাঁড়াতে

না পারে। মানুষকেও তাই করতে হবে। মনোভাব এমন, কেন ৩০ বছর পর্যন্ত খাটব আমি? কেন আমি ত্যাগ স্বীকার করব? সন্তান জন্ম নিয়েছে এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সে এখন বড় হয়েছে। সে নিজের কাজ করে বেড়াক। আমার কোনো দায়িত্ব নেই। আমার স্বার্থ কেন ত্যাগ করব? আমি কেন আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাদ দেবো? সুতরাং পরিবারের যে বর্তমান দুর্দশা সেটি অনেকটা সেকুলার মতাদর্শের কারণেই। আরো খারাপ হতে পারত, কিন্তু খ্রিস্টবাদের যেটুকু প্রভাব এখনো রয়েছে, তার জন্য অতটা হয় নি। যতটা ভালো থাকল, তা সম্পূর্ণভাবে খ্রিস্টান মতাদর্শের কারণে। আর যতটা মন্দ হলো তা এই মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের কারণে; জীবন ও নৈতিকতাকে আলাদা করার সেকুলার মতাদর্শের কারণে।

এর সমাধান কী? আমার জানা মতে, দু'ভাবে এর সমাধান হতে পারে। একটি হলো, মুসলিম হিসেবে আমরা আল্লাহর কাছে, তাঁর নির্দেশনার দিকে যাই বা নিজেদেরকে সোপর্দ করি। সব সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে মুক্তবুদ্ধির মিথ্যা দর্শন। তাদের কথা হচ্ছে, গডকে বাদ দাও। অথচ তাকেই সবচেয়ে কাছে রাখতে হবে। তাকে সব সময় অবলম্বন করতে হবে। তাঁর ওপর আস্থা রেখেই জীবনযাপন করতে হবে। তার কাছে আমরা সব দিক দিয়ে আবদ্ধ, দায়বদ্ধ। তাকে বাদ দেয়া চলবে না। এটি হলো মুসলিম হিসেবে আমাদের বক্তব্য। হিন্দু হিসেবে যদি কেউ বলে, তাহলে বলতে হবে স্রষ্টার দিকে যাওয়া, নৈতিকতার দিকে, ধর্মের দিকে ফিরে যাওয়া। তাই সমাধান হিসেবে বলছি, যেভাবেই হোক, মানুষকে নৈতিক শিক্ষা ফিরিয়ে আনতে হবে। নৈতিক শিক্ষার জন্য ধর্ম ছাড়া আর কোনো ভিত্তি নেই।

মুসলিম দেশে ইসলামকে ভিত্তি করতে হবে এবং অমুসলিমদের বিকল্প থাকবে। অমুসলিমদের দেশে তাদের ধর্মকে কেন্দ্র করে তাদের নৈতিকতার ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সেখানে মুসলিমদের জন্য বিকল্প থাকবে বলে আশা করি।

এভাবে যদি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তবে আশা করা যায়, ভালো মানুষ তৈরি হওয়া শুরু হবে। ভালো লোক তৈরি হলে সবক্ষেত্রে ভালো আসবে। সব ক্ষেত্রেই ভালো লোক তৈরি হবে। রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবার– সব ক্ষেত্রে। কেবল থিওরি দিলেই কিছু হবে না। আর আমার কথাতেই সব কিছু বদলে যাবে না। তবে মানবতাকে পুনরুদ্ধারের কাজ তো শুরু করতে হবে। এ কথাও আমরা জানি অসম্ভব বলে কিছু নেই।

প্রাসঙ্গিক আরো কিছু কথা বলা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের বিরোধী ছিল বলে খ্রিস্টান চার্চের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য, এটি কতটা প্রপাগাণ্ডা আর কতটা সত্য জানি না। এটি খতিয়ে দেখতে হবে। যদি এরকম কিছু হয়ে থাকে, তাহলে তা ভুল ছিল। চীন ও ভারতে বিজ্ঞান অনেক উৎকর্ষ লাভ করেছে। এখানে বিজ্ঞানীদের কখনো বিরক্ত করা হয় নি।

মুসলিমদের হাতে বিজ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করেছে। মুসলিম ইতিহাসে বিজ্ঞানীদের ওপর কোনো অত্যাচার হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। খ্রিস্টবাদের মধ্যযুগে

যেটা হয়েছে, তাকে Generalize করা মোটেও ঠিক হবে না। কে বলতে পারবে যেকোনো আন্দোলন– সেটা কমিউনিস্ট হোক, গণতান্ত্রিক হোক– তার মধ্যে কোনো ত্রুটি হয় নি? খ্রিস্টবাদকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেয়া তাদের অতি প্রতিক্রিয়া। তারা শুধু বলতে পারত– এটি ঠিক না; এটি দেয়া যাবে না। বিজ্ঞানকে নিজের পথে চলতে দিতে হবে।

এখানে উল্লেখ করতে চাই ইসমাইল আল রাজীর বই তওহিদ-এ উল্লিখিত মন্তব্যের কথা। তিনি বলেছেন, God is not against science, God is the condition of science, not an enemy of science। আল্লাহ্ আছেন বলেই তিনি একটি শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন। এটি আছে বলেই বিজ্ঞানের সূত্র বের করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ্ না থাকলে কোনো শৃঙ্খলা থাকত না, কোনো বিজ্ঞানও সৃষ্টি হতো না।

বিজ্ঞানের কারণে যে উন্নয়ন হয়েছে কোনো ধর্ম তাতে হস্তক্ষেপ করে নি। খ্রিস্টান ইউরোপে যে দুই-একটি উদাহরণ পাওয়া যায়, সেটিকে তাদের ভুল বলে গণ্য করতে পারি। কিন্তু খ্রিস্টান নেতৃত্ব বা পোপরা কেউই বিজ্ঞানের বিরোধী নন। আমরা বুঝতে পারি যে, মানবজাতি ছিল মূলত ধার্মিক, সেটিকে সেকুলাররা সেকুলারমনা করে দেয়। তাদের আবার ধার্মিকমনা করতে হবে। ইসলামিমনা করতে হবে। ধার্মিক মন ও সেকুলার মনের মধ্যে পার্থক্য কী? ইসলামি মন হচ্ছে, সেই মন যে কোনো সমস্যা হলে এর সমাধান খুঁজে কুরআন ও সুন্নাহতে। তারপর অন্যান্য দিকে। অন্য দিকে, সেকুলার মন চিন্তা করে না আল্লাহর কিতাবে কী আছে? সে ভাবে, আমাদের যুক্তিবাদী পণ্ডিতরা কী বলেছেন; রাজনৈতিক পণ্ডিতরা কী বলেছেন বা রাশিয়া, চীন, আমেরিকা, কানাডা কী করেছে। তারা দুনিয়াকে ধার্মিক মন থেকে সেকুলার মনে নিয়ে গেল। তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সারা দুনিয়াকে একটি নৈতিক ছকে নিয়ে আসা; ধার্মিক মনকে ফিরিয়ে আনা।

'সেকুলার' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের পরে, উনবিংশ শতাব্দী থেকে। মুক্তবুদ্ধির ধারণা গ্রহণ করে পুরো শিক্ষিতসমাজ মোটামুটি সেকুলার হয়ে গেছে। আমাদের অসংখ্য লোক নামাজি, আবার সেকুলার। তারা সমস্যার সমাধান ইসলামে খোঁজেন না। এসব সেকুলার মনকে ইসলামি মনে পরিবর্তন করতে হবে। এ জন্য তাদের কিছু মৌলিক বই পড়াতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। আশা করি, যথাযোগ্য চেষ্টা করলে আমরা সাফল্য লাভ করব, ইনশাআল্লাহ্।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সময়ের প্রধান ইস্যুসমূহ

বিগত দিনগুলোতে আমার কাছে মুসলিম উম্মাহর জন্য কতগুলো বিষয়কে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এর মধ্যে একটি ইস্যুতে আমার মনকে কিছুটা পরিবর্তন করেছি যা আমি আগে এতো বড় ইস্যু হিসেবে দেখি নি। সেটি হলো নব্য সাম্রাজ্যবাদ (New Imperialism)। এ সাম্রাজ্যবাদীরা কারা তা আমরা সবাই জানি। আজ তারা চাচ্ছে রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে বিশ্বকে শাসন করতে। তারা চায় তাদের আদেশ নিষেধকেই (Dictation) মেনে চলতে হবে, তাদের মতো চলতে হবে। আইএমএফ (IMF), বিশ্বব্যাংক (World Bank) কিংবা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (World Trade Organisation) মাধ্যমেও এ রকম ডিকটেশন আসতে পারে।

পাশ্চাত্য শাসনের অধীন থেকে মুক্ত হওয়ার অনেক উপায়ের মধ্যে একটি হলো অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়া। বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল না হওয়া। আজকের দিনে আমেরিকান এ শাসন থেকে বাঁচার একটি উপায় হলো কোনো দেশকে বিদেশি সাহায্য থেকে মুক্ত হওয়া। যারা অর্থনীতি সম্পর্কে কমবেশি ধারণা রাখেন তারাও জানেন আমাদের মতো দেশগুলোতে অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তার দিক হলো বিদেশি সাহায্য (Foreign Aid)। যদি কোনো দেশ বিদেশি সাহায্য থেকে মুক্ত হতে পারে তাহলে তারা পাশ্চাত্যের প্রভাব থেকেও মুক্তি পেতে পারে।

নয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রসঙ্গে আফগানিস্তানের পরিস্থিতিতে বলা যায় আন্তর্জাতিক আইনে আমেরিকার কোনো অধিকার ছিল না আফগানিস্তান আক্রমণ করার। আন্তর্জাতিক আইনে একটি রাষ্ট্রের আরেকটি রাষ্ট্র আক্রমণ করার কোনো অধিকার নেই। আমেরিকা একটি আক্রমণাত্মক শক্তি। তারা এমন একটি দেশ যারা কোনো প্রকার আন্তর্জাতিক আইন মানে না। বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন বলে, যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে তা জাতিসংঘে তোলা উচিত। আর জাতিসংঘ কোনোভাবেই একটি দেশের উপর আক্রমণ করার কথা বলতে পারে না। খুব বেশি হলে জাতিসংঘ অবরোধ কায়েম করার কথা বলতে পারে, এর বেশি কিছু নয়। নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব নিরাপত্তা রক্ষা করা, নিরাপত্তা বিঘ্ন করা কিংবা আক্রমণ করা নয়। এদিকে আমেরিকা শুধু আক্রমণ করছে তা-ই নয়; তারা বলছে বিন লাদেনকে তাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। কিন্তু তারা তা বলতে পারে না। আমি কে যে আমার হাতে কোনো এক ব্যক্তিকে হস্তান্তর করতে হবে? তার বিরুদ্ধে আমি তো দেশিয় কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো কোর্টে মামলা দায়ের করি নি। আর সেখানে কোনো রায়ও হয় নি যে রায়ের ভিত্তিতে হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু আমেরিকা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে তা করেছে। শুধু তাই নয়, তারা

বন্দীদেরকে হত্যা করে। তারা মাজারি শরিফে বোমাবর্ষণ করে বন্দীদেরকে হত্যা করেছে। প্রিজন রায়ট হয়েছে কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই। আর যদি হয়েও থাকে তাহলেও বোমাবর্ষণ করে কোনো প্রিজন রিভল্ট দমন করা হয় না। সাধারণত কয়েকদিন খাবার, পানি দেয়া হয় না। তারপর এর সমাপ্তি হয়। মি. রামসফিল্ড বলেছেন:

> Capture or killed and we have done the second thing.

এ হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব আমেরিকান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জনাব বুশ থেকে আরম্ভ করে রামসফিল্ড এবং এর সাথে জড়িত সকল কমান্ডারদের উপর পড়বে। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রেসিডেন্ট বুশ, ব্লেয়ারসহ তাদের যেসব কমান্ডার, সৈন্য বাহিনী নর্দান এলায়েন্সে যারা জড়িত– এদের সবার বিচার হওয়া উচিত, দণ্ড হওয়া উচিত।

তালেবানের নানারকম সমস্যা আছে। আফগান ও মুসলিম এলিটরা তাদের থেকে দূরে সরে গেছে। তারা টেলিভিশন ধ্বংস করে দিয়েছে, মেয়েদেরকে পড়তে দেয় নি, বুদ্ধমূর্তি মুসলিমদের প্রতিবাদের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়েছে। পাঁচ বছরেও তারা কোনো ইলেকশন করতে পারে নি। এমনকি কান্দাহারেও কোনো ইলেকশন করতে পারে নি। তারা তাদের কোনো বৈধতা (Legitimacy) সৃষ্টি করতে পারে নি। এসব সমস্যা সেখানে ছিল। কিন্তু এর মানে এ নয় যে বাইরের কোনো একটি শক্তি জোর করে আফগানিস্তানের সরকার পরিবর্তন করে দেবে।

নব্য সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে কোনো দেশের সরকারগুলো কিছু করবে না। তাদের অনেকেই বড় বড় শক্তিগুলোর পক্ষে এজেন্টের মতো কাজ করছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে একমাত্র জনগণ এবং এজন্য জনগণের নেতাদেরকে সংগঠিত করতে হবে। এ কথা সত্য যে, নব্য সাম্রাজ্যবাদী সব জালেমদের সব সময় পতন হয়। নৈতিক মানবিকতা তা-ই বলে।

নব্য সাম্রাজ্যবাদের পর মুসলিম বিশ্বের জন্য অন্যতম প্রধান ইস্যু হলো শিক্ষা। এ বিষয়টিকে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। Islamization of Knowledge-এর লেখক ড. ইসমাইল রাজি আল ফারুকির দৃষ্টিতে শিক্ষা উম্মাহর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। আমি একটু আগে যে চ্যালেঞ্জের (আমেরিকান ডিক্টেটরশিপ, আমেরিকান চ্যালেঞ্জ, পশ্চিমা চ্যালেঞ্জ) কথা বললাম তা মোকাবিলা করার জন্য আমাদেরকে একটি ভালো শিক্ষাব্যবস্থা দাঁড় করাতে হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমেরিকা ও পশ্চিমাদের চ্যালেঞ্জ, সেটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক যেটিই হোক– এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের একটি ভালো শিক্ষাব্যবস্থা দরকার। সভ্যতার দ্বন্দ্বে ইসলাম জয়ী হবে, নামে হোক বা বেনামে হোক, যদি আমাদের একটি ভালো শিক্ষাব্যবস্থা এবং ভালো শিক্ষিত জনশক্তি (পুরুষ ও নারী) থাকে। কিংবা যদি আমরা তা গড়তে পারি, তবেই তা সম্ভবপর হবে বলে আমি মনে করি।

এখানে আমি শিক্ষার কয়েকটি জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। একটি হলো এর সংজ্ঞাগত বিষয়। ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে কতগুলো সংজ্ঞাগত বিষয়

রয়েছে। ইসলামি শিক্ষা কি? এটি কি শুধুই কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহর জ্ঞান? নাকি এটি সকল প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের ইসলামি মূল্যবোধ, জ্ঞানের ইসলামিকরণ আন্দোলনের সমন্বয়? মালয়েশিয়া, পাকিস্তানে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি বিষয় বেরিয়ে এসেছে, সেটি হলো– সকল শিক্ষাই ইসলামি মূল্যবোধকে ধারণ করবে, ইসলামি শিক্ষার আওতার মধ্যে হবে, মূল্যবোধভিত্তিক হবে অথবা এর আওতা বহির্ভূত হবে না। তারা এটি মেনে নিয়েছে যে শুধু কুরআন পড়া, হাদিস পড়া, শুধু ফিকাহ পড়া, আরবি পড়া ইসলামিক শিক্ষা নয়। যদি আমাদের ছেলেরা কম্পিউটার সায়েন্স, ফিজিক্স এবং অন্যান্য সায়েন্স পড়ে এবং তাতে যদি গ্রহণীয় ইসলামি বিষয়ও শিক্ষায় সংযোজিত করা হয় অথবা অন্য কোনোভাবে রাখা হয় তা-ও ইসলামি শিক্ষার আওতার মধ্যে হবে। কাজেই বলা যায়, যে কোনো ভাবেই হোক বর্তমানে সংজ্ঞাগত সমস্যাটি নেই। কিন্তু হতে পারে যারা দুনিয়া সম্পর্কে জানে না তারা হয়তো বিতর্ক করতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি এলিটদের মধ্যে এ সমস্যাটি নেই এবং আল্লাহতায়ালা চাইলে সেভাবেই বিষয় এগিয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

এখন আমি আমাদের স্কুল সিস্টেম সম্পর্কে বলতে চাই। বর্তমানে স্কুলের উপর অনেক কাজ হয়েছে– বিশেষভাবে পাকিস্তান, ইরান, সুদানে। সৌদি আরবে স্কুল সিস্টেমে ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার দারুণ সমন্বয় ঘটেছে। সুতরাং বলা যায় আজ আমাদের যথেষ্ট স্কুল শিক্ষার কারিকুলাম আছে যা আমরা বাংলাদেশে নিয়ে আসতে পারি। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আজ আমরা যেখানে এসেছি তার ফলে এখানে ইসলামি শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় গড়ে ওঠা সম্ভব। বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বকে মালয়েশিয়া বা ইসলামাবাদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ভিত্তিতে শিক্ষা প্রোগ্রাম সাজাতে হবে। প্রয়োজন মনে করলে এ মডেলকে একটু রিফাইন্ড করে, প্লাস-মাইনাস করে আমরা সেটি নিতে পারি। এটি মুসলিম বিশ্বে উচ্চ শিক্ষার ইসলামিকরণে মডেল হতে পারে। এখানে একটি কথা বলতে হবে, অমুসলিমদের জন্য পর্যাপ্ত বিকল্প খোলা রাখতে হবে। এটি আমাদের মনে রাখতে হবে এবং যদি কেউ না-ও করে থাকে তবে আমাদের তা করতে হবে। ইসলামের 'লা ইকরাহা ফিদদিন' এবং 'জাস্টিস'-এর যে স্পিরিট তা সামনে রাখতে হবে। 'লা ইকরাহা ফিদদিন' ও 'জাস্টিস'-এর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। একে সামনে রেখে অমুসলিমদের জন্য প্রচুর অপশন (যেখানে যেরকম প্রয়োজন) দেয়া উচিত। এখানে কোনো আন্দোলন সৃষ্টি করা, কারো দাবির সুযোগ সৃষ্টি করা, অথবা পত্রিকায় উঠার পর ব্যবস্থা নেয়া যেন না হয়। এটি ইসলামের জাস্টিসের দাবি এবং এটিই আমাদের জন্য ভালো।

এখানে মাদরাসা স্ট্রিম সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। মাদরাসা স্ট্রিম সম্পর্কে আমি খুব ব্যাপকভাবে চিন্তা করেছি। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি মাদরাসাকে শুধু আলেম তৈরি করার জন্যই চাচ্ছি? তার উদ্দেশ্য কী? নাকি শিক্ষার একটি মূলধারা করতে চাচ্ছি? প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি শুধু আলেম তৈরি করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তো এতো মাদরাসার দরকারই নেই। এতো কওমি কিংবা এতো আলিয়া

মাদরাসার তাহলে প্রয়োজন কী? যদি আমরা চাই মাদরাসা ধারা অন্যতম একটি মূলধারা হবে তাহলে রেডিক্যাল পরিবর্তন করতে হবে। এই পরিবর্তনটি কী? আমাদের দেশে কামিল মাদরাসায় চারটি কোর্স আছে– আদব, তাফসির, ফিকাহ ও হাদিস। আমি সংক্ষেপে বলবো আরো কয়েকটি কামিল কোর্স তাতে যোগ করতে হবে। কামিল ইকোনোমিকস, কামিল পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে কামিল খুলতে হবে। চারটির জায়গায় ছয়টি, আটটি বা দশটি করতে হবে। তাতে বর্তমান কোর্সটি আলিম, ফাজিল পর্যন্ত মোটামুটি এক থাকতে পারে। তারা বর্তমানে কি করে? এক পর্যায় পর্যন্ত এ রকম পড়ে তারপর আলাদা হয়ে যায়।

তেমনিভাবে ফাজিল পর্যন্ত ঠিক রেখে আমাদেরকেও আরো চারটি, ছয়টি কোর্স যোগ করতে হবে। সে সাথে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। কওমি মাদরাসার ক্ষেত্রেও একই কথা। যদি মসজিদ আর মাদরাসার জন্যই শুধু আলেম তৈরি করা মাদরাসার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তো এতো হাজার হাজার কওমি মাদরাসার দরকার নেই। কিন্তু তাদের যদি উদ্দেশ্য থাকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি তৈরি করা তাহলে তাদেরকেও নতুন নতুন বিভাগ খুলতে হবে। এখন কেবল দাওরায়ে হাদিস আছে। তাদের শেষের চার বছর পরিবর্তন করতে হবে। এখানে দাওরায়ে একতেমাদের (অর্থনীতি) মতো আরো তিন-চারটি দাওরা বাড়াতে হবে যাতে তারা জাতি, সমাজ, অর্থনীতি ও প্রশাসনের জন্য আরো বেশি উপযোগী হতে পারে। তাহলেই তারা সমাজ, অর্থনীতি, প্রশাসনের জন্য যোগ্য লোক তৈরি করতে পারবে। এ ধরনের সংস্কার করলেই কওমি মাদরাসা এবং আলিয়া মাদরাসা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দু'টি মূল শাখা হিসেবে টিকে থাকবে এবং অবদান রাখতে পারবে।

এরপর আমি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সহশিক্ষা নিয়ে আলোচনা করবো। সহশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে দু'টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। মালয়েশিয়ায় ড্রেসকোডসহ (হিজাব সহ) একত্রে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং ইসলামাবাদে ক্যাম্পাস আলাদা করে দেয়া হয়েছে। ইসলামি শিক্ষাবিদগণ দু'টিকেই বৈধ গণ্য করেছেন। আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সহশিক্ষা খুব সুবিধাজনক মনে করি না। আমাদের বর্তমান সমাজ পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ার তুলনায় অধিক সেকুলার। এখানে আলাদা ক্যাম্পাস করা ভালো ও সঙ্গত। তবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইসলামি শিক্ষাবিদগণ যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সে কথা আলাদা। কিন্তু অবশ্যই ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা ক্যাম্পাসই লক্ষ্য হওয়া উচিত। হাই স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে সহশিক্ষা একেবারেই থাকা উচিত নয়। এর ফলাফল খুব খারাপ হয়।

এখন অন্য ইস্যু যেমন আধুনিকীকরণের দিকে নজর দিই। Islamic Awakening Between Rejection and Extremism নামে ড. কারযাভির একটি বই আছে। এতে তিনি চরমপন্থার (Extremism) কুফল, বিপদের সম্ভাবনা এবং এর কারণসমূহ তুলে ধরেছেন। এ বইয়ের বাংলা অনুবাদ বেরিয়েছে 'ইসলামী

পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা' নামে। কারযাভির মতো মুসলিম বিশ্বের প্রধান চিন্তাবিদরা মনে করেন মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন রকম চরমপন্থা বা উগ্রতা রয়েছে। এদের স্বভাব সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এরা একে অন্যকে সব সময় অভিযুক্ত (Accuse) করে। নিজের মতের বাইরে শুনতে চায় না। ইসলামের স্বভাব মধ্যপন্থা, চরমপন্থা নয়। চরমপন্থার ক্ষতি আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। এটি দূর করা খুবই প্রয়োজন।

যেখানে আমাদের ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা জরুরি সেখানে সময় কোথায় যে আমরা গুরুত্বহীন (Marginal) বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করবো। যেখানে মুসলিম বিশ্বে দারিদ্র্যতার সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা– সেখানে আমাদের কার দাড়ি কতো বড় সেটি কোনো বিষয় হতে পারে না। কিছু লোক আমাদের প্রধান বিষয়সমূহের পরিবর্তে মাইনর বিষয়গুলোকেই বেশি করে তুলে ধরতে থাকে। কিন্তু এটি আমাদের বুঝতে হবে যে একটি বিল্ডিংয়ের কাঠামো দাঁড় করাবার পর সেটির বিন্যাস বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে আগে বিল্ডিংয়ের কাঠামো দাঁড় করাতে হবে। তেমনিভাবে যেখানে ইসলাম এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি সেখানে ইসলামের মূল কাজ করার পরই অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে, যদি তা জরুরি মনে করা হয়। আর ততটুকু করা যেতে পারে যতটুকু ইসলাম জরুরি মনে করেছে। কিন্তু এখানে বাস্তবে ইসলামের মূল স্পিরিটটিই নেই। সেটি উপড়ে ফেলা হয়েছে। তাহলে এ অবস্থায় কি সেসব মার্জিনাল বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়? এ প্রসঙ্গে অন্য কিছু বলার চেয়ে বিষয়টি উপলব্ধির জন্য আমাদের ড. কারযাভির সেই Islamic Awakening Between Rejection and Extremism বইটি পড়া উচিত।

ইসলামের একটি অন্যতম প্রধান বিষয় হলো বিভিন্ন রকম চরমপন্থা (Various type of extremism) যা ইসলামকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। যারা চরমপন্থি তাদের অবস্থান কারোর হয় এ পাশে নয় ঐ পাশে, যে কোনো এক প্রান্তে। ফলে তারা কখনো সমন্বয় করতে জানে না। সমন্বয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সমন্বয় করা তখনই সম্ভব যখন মানুষ মডারেট হয়, মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। যখন তারা একে অন্যের সাথে কথা বলে, আলাপ করে, একজন আরেকজনের কথা শোনে– তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েই কাজ করে। কিন্তু কট্টরপন্থা হলো উম্মতের মধ্যে এমন অবস্থান সৃষ্টি করা যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে না পারে।

এরপর ইসলামের যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি তা হলো জেন্ডার ইস্যু। এটি ইসলামে নারী-পুরুষের স্থান এবং পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়। মেয়েদেরকে পিছনে রেখে ইসলাম কিংবা উম্মত অগ্রসর হবে, তা দিবাস্বপ্ন দেখা। ড. সাঈদ রামাদান, যাকে লিটল হাসান আল বান্না বলা হতো– তিনি উম্মতের তিনটি সমস্যার কথা বলেছিলেন। একটি হলো শরিয়াহ এবং ফিকাহর মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা। কুরআন-সুন্নাহর বাধ্যতামূলক প্রকৃতির (Binding Nature) সাথে ফিকাহর বাধ্যতামূলক নয় এমন প্রকৃতির পার্থক্য করতে না পারা

এবং দু'টিকে এক করে ফেলা। দ্বিতীয় সমস্যা হলো মুসলিম নারীর দুর্দশা। এ কথাগুলো তিনি বলেছিলেন ১৯৬৫ সালের দিকে। আজ থেকে অনেক আগেই তিনি এটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এটি বর্তমানে যেমন ড. ইউসুফ আল কারযাভির উপলব্ধি, তেমনি মুহাম্মদ আল গাজ্জালির মতো গ্রেট আলেমরাও একই কথা বলে গেছেন। আল গাজ্জালি মিসরের লোক, যিনি দুই বছর আগে মারা গেছেন। তৃতীয় সমস্যা হলো শাসকদের আনুগত্য সম্পর্কে ভুল ধারণা (Wrong motions of obedience to rulers)। নারীদেরকে তার যথাযোগ্য স্থান দিতে হবে। তাদেরকে সমাজ এবং ইসলামের কাজে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদেরকে মানবিক মর্যাদায় সমান মানুষ মনে করতে হবে। তাদের সকল অধিকার দিতে হবে। (দ্রষ্টব্য : ১. ইসলামের সামাজিক বিধান, ড. জামাল আল বাদাবী, ২. রাসুলের যুগে নারী স্বাধীনতা, আল্লামা আবদুল হালিম আবু শুক্কাহ এবং ৩. দি স্ট্যাটাস অব মুসলিম উইমেন, ড. ইউসুফ আল কারযাভি)।

এরপর যে সমস্যা আমি মনে করি তা হলো গণতন্ত্রের অভাব। স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র মুসলিম বিশ্বে আছে। এটি পাশ্চাত্যর কাছে মুসলমানদের খারাপ ইমেজই তুলে ধরে। তাদের কাছে মনে হয় মুসলমানদের স্বভাবই হলো এমন। দোষ হলো আমাদের আর তারা দেখছে ইসলামই এমন। এর খারাপ প্রভাবটাই মুসলমানদের উপর পড়ে। কিন্তু এর সমাধান কী? এ সম্পর্কে আমি এক লেখায় লিখেছিলাম, ইসলামি আইনের আওতায় গণতন্ত্র শব্দটি বহু পূর্বেই স্বীকৃত হয়ে গেছে। ১৯৪৮ সালে যখন পাকিস্তানের সংবিধান হয় সেখানে Democracy, freedom, equality, social justice as enanciated by Islam shall fully observed বলে একটি ধারাই আলেমদের পরামর্শে যোগ করা হয়। আমি লক্ষ করেছি মাওলানা মওদূদী 'ডেমোক্রেসি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সেখানে তিনি Theo-Democracy শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। তিনি ডেমোক্রেসি শব্দটি পরিহার করেন নি। আল্লামা ইকবালও গণতন্ত্রের চেয়ে ভালো বিকল্প নেই বলেছেন। ড. ইউসুফ আল কারযাভি Islamic Movement, Political Freedom and Democracy লেখায় বলেছেন যে এটিই ইসলামের নিকটতম পন্থা। যারা সন্দেহ করে জনগণের সার্বভৌমত্ব, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস, এ ধারণার কি হবে? এ সন্দেহের উত্তরে তিনি বলেছেন–

> আপনারা যদি এতোই ভয় পান তাহলে সংবিধানের একটি ধারায় লিখে দিন, কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন পাস করা যাবে না, তাহলেই সমস্যার সমাধান হবে।

কাজেই গণতন্ত্র সম্পর্কে যারা বেশি ভয় পান তারা যদি গণতন্ত্র না বলতে চান তাহলে 'ইসলামি গণতন্ত্র' শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। অনেকে খেলাফত শব্দ ব্যবহার করতে চান। কিন্তু প্রত্যেকটি ইসলামি রাষ্ট্রকে আলাদা আলাদা খেলাফত বলবেন কি না? তারপর সুস্পষ্ট করতে হবে খেলাফতের বিস্তৃত রূপ কী? পার্লামেন্ট থাকবে কি না? নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন হবে কি না? মৌলিক অধিকার কী

কী হবে? এসব ধারণা সুস্পষ্ট না করে খেলাফত কায়েমের দাবি করায় জটিলতা সৃষ্টি করবে। যতদিন তা না করা হবে ততদিন পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণ ইসলামি রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্র পরিভাষা ব্যবহারের পক্ষে।

আমাদের সমস্যার আরেকটি দিক হলো কুরআন এবং সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা। এমন এক সময় ছিল যখন কুরআন এবং হাদিসের পর্যাপ্ত অনুবাদ ছিল না। এখন অনেক অনুবাদ হওয়ায় সমস্যা হয়েছে যে প্রত্যেকে হাদিস পড়ে তার একটি ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করেন, কিন্তু তারা জানেন না হাদিস কতো ধরনের। তারা জানেন না যে হাদিসের মধ্যে যদি সংঘাত দেখা দেয় তাহলে তা কীভাবে দূর করতে হবে। আবার কুরআনের সঙ্গে হাদিসের যদি বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা কীভাবে দূর করতে হবে? এর ব্যাখ্যা পদ্ধতি না জেনেই তা করতে থাকে। কীভাবে 'তারুদ' (বিরোধ) দূর করতে হবে? হুকুমের মূল্য কী? সব হুকুমই কী ফরজ না মুস্তাহাব মাত্র? আমল হলেই কি ফরজ হয়ে যায়? এখন যারা শব্দের বিভিন্ন শ্রেণি (যেমন আম, খাস, হাকিকি, মাজাফি ইত্যাদি) জানবে না, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পদ্ধতি জানবে না, উসুল আল ফিকাহ পড়বে না– তারা যদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তাহলে তা ভুল হবে। এজন্য উসুলের জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উম্মতের মধ্যে সমস্যা বেড়েছে। ধর্মীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে মতবিরোধ বেড়েছে। এজন্য প্রয়োজন অনেক সংখ্যক বড় আলেমের। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, আমরা যারা ইসলামের মূল বিষয় জানি না তারা এক ধরনের মূর্খ। এ মূর্খতা থেকে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয় সেটি ইসলামের জন্য বিপজ্জনক। এ অবস্থা থেকে বাঁচার উপায় হলো উসুল আল ফিকাহর জ্ঞান এবং নির্ভরযোগ্য ইসলামি সাহিত্য ছড়ানো। আর সাথে আধুনিক সমস্যা ও সভ্যতা জানে এমন গ্রেট আলেম তৈরি করা যারা লোকদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারবে। উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে যে, ড. কারযাভির মতো কিছু গ্রেট আলেম থাকার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের সকলে একটি মতে এসে পৌঁছেছেন। বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে আধুনিক সমস্যা ও সভ্যতা সম্পর্কে অবহিত অত্যন্ত উচ্চমানের আলেমের উদ্ভব হতে হবে। সেটি মুসলিম বিশ্বের জন্য কল্যাণকর হবে।

আশা করি, মুসলিম বিশ্বের এসব প্রধান সমস্যা সমাধানে আমরা সবাই উদ্যোগী হবো।

গণতন্ত্র ঃ প্রেক্ষিত ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র একটি পরিচিত শব্দ। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। গণতন্ত্র আধুনিক বিশ্বে একটি স্বীকৃত ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা। অন্যদিকে দেখা যায় গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন মতামত। বিভিন্ন ইসলামি দলের এজেন্ডায় রয়েছে গণতন্ত্রের কথা, অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা। আবার এমন সব দল বা ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা যায়, যারা গণতন্ত্রকে ইসলামসম্মত মনে করেন না, কেন না গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে আমাদের সূক্ষ্ম ও গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শব্দগত মারপ্যাচের উর্ধ্বে গিয়ে বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা দরকার। আমরা দেখছি আধুনিক বিশ্বে ইসলামি দলসমূহ ও ব্যক্তিবর্গ, ইসলামি পণ্ডিতগণ এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন যেখানে সরকার পার্লামেন্টের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করবে। সকলের মত প্রকাশের অধিকার তথা ভোটাধিকার থাকবে, আইনের শাসন থাকবে, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা থাকবে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে, মৌলিক মানবাধিকার রক্ষিত হবে ইত্যাদি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলা হয় তখন তার পূর্বশর্ত হিসেবে এসবের কথাই বলা হয়। অর্থাৎ গভীর বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলামি দলগুলোর সরকার ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গঠন কাঠামো একই ধরনের।

তত্ত্বগতভাবে বলা যায় যে, কেবল সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে যখন ইসলামে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মুখ্য সেখানে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে। যদিও এখানে উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, সার্বভৌমত্বের ধারণা পাশ্চাত্যে এক রকম নয়। কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ রকম কথা বলেছেন যে, সার্বভৌমত্বের ধারণার কোনো প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থে সার্বভৌমত্বের ধারণাকে তেমন গুরুত্বের সাথে আলোচনাও করা হয় না। তবে ইসলামি দলগুলোর মধ্যে সার্বভৌমত্ব শব্দটির আপত্তি সম্পর্কে এ সময়ের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভি প্রণীত 'Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase' গ্রন্থের 'The Movement and Political Freedom and Democracy' শীর্ষক আলোচনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করছি :

> The fear of some people here is that democracy makes the people a source of power and even legislation

> (although legislation is Allah's alone) should not be heeded here, because we are supposed to be speaking of a people that is Muslim in its majority and has accepted Allah as its Lord, Mohammad as its Prophet and Islam as its Religion. Such a people would not be expected to pass a legislation that is contestable in Islam and its incontestable principles and conclusive rules. Anyway, these fears can be overcome by one article (in the constitution) that any legislation contradicting the incontestable provisions of Islam be null and void.
>
> কিছু সংখ্যক মানুষের ভয় গণতন্ত্র মানুষকে ক্ষমতার উৎসে পরিণত করে এবং আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেয় (যদিও আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর), তার প্রতি কর্ণপাত করা উচিত হবে না। কারণ আমরা এমন এক মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে কথা বলছি যারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আল্লাহকে তাদের প্রভু হিসেবে, মুহাম্মদকে তাদের নবী এবং ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়েছে। আশা করা যায়, এ ধরনের মানুষ এমন আইন প্রণয়ন করবে না যা ইসলামের অকাট্য নীতি ও সিদ্ধান্তমূলক আইনের পরিপন্থী হবে। যাহোক, ইসলামের অলঙ্ঘনীয় বিধানের পরিপন্থি যে কোনো আইন বাতিল বলে গণ্য হবে এমন একটি অনুচ্ছেদ সংবিধানে সংযোজন করে এ আশংকা দূর করা যেতে পারে।

এছাড়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষ তথা উম্মতের দায়িত্ব সম্পর্কে মহাকবি ড. আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবালের মতামত হচ্ছে এরকম :

> ইসলাম গোড়াতেই স্বীকার করে নিয়েছে যে, বাস্তবে রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারক ও বাহক হলো উম্মত এবং যেসব কার্যক্রম নির্বাচকমণ্ডলী তাদের নেতা নির্বাচনের নিমিত্ত গ্রহণ করে তার অর্থ শুধু এই যে, তারা তাদের সম্মিলিত ও স্বাধীন নির্বাচন পদ্ধতি দ্বারা উক্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে এমন একজন নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মাঝে ন্যস্ত করে দেয়, যারা তাকে উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করে। ইসলামি আইন প্রণয়নের ভিত্তি মিল্লাতের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি ও যৌথ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত।[১]

আমরা দেখছি যে, অনেক ইসলামি পণ্ডিত গণতন্ত্র শব্দকে শর্তসাপেক্ষে ইসলামের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। ড. আবু সাঈদ নূরুদ্দীন-এর 'মহাকবি ইকবাল' গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই যে আল্লামা ইকবাল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু তার লেখায় উল্লেখ করেছেন যে গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। তিনি তার 'Reconstruction of Religious Thought in Islam'-এর ৬ষ্ঠ

ভাষণে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে আরও বলেন :

> ইসলামি রাষ্ট্র স্বাধীনতা, সাম্য এবং স্থিতিশীলতার চিরন্তন বিধানসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির নীতিমালা শুধু ইসলামের মৌলিক ভাবধারার সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং যেসব শক্তি মুসলিম বিশ্বে কার্যরত রয়েছে তাকেও সুসংহত করা অপরিহার্য।[২]

ইকবালের মতে, গণতন্ত্রের ভিত্তি যদি রূহানী ও নৈতিক হয় তাহলেই তা হবে সর্বোৎকৃষ্ট রাজনৈতিক পদ্ধতি। ইসলামি রাষ্ট্রকে এ কারণেই তিনি 'রূহানী গণতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইংরেজি সাময়িকী 'The New Era'-এর ২৮ জুলাই ১৯১৭ সংখ্যায় তিনি বলেন :

> ইসলামে গণতন্ত্র অধিকাংশ ইউরোপীয় সমাজসমূহের মতো অর্থনৈতিক সুযোগের সম্প্রসারণ থেকে উৎপন্ন হয় না; বরং এটি একটি রূহানী নীতি, যা ঐ কথার ভিত্তিতে এসেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলো সুপ্ত শক্তির এমন একটি আধার, যার সম্ভাবনাসমূহকে এক বিশেষ গুণ ও চরিত্রের দ্বারা উন্নত করা যেতে পারে।[৩]

অর্থাৎ ইসলাম এমন এক গণতন্ত্র দিয়েছে যা আল্লাহর আইনের অধীন। অন্যদিকে আমরা দেখি মাওলানা মওদূদী তার 'ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ' গ্রন্থে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য 'Theo-Democracy' শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তিনি 'Democracy' বা গণতন্ত্র শব্দটি পরিত্যাগ করেন নি বরং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে এটিকে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে প্রদত্ত একটি বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

করাচির 'আখবারে জাহান' পত্রিকায় ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> ইসলাম ও গণতন্ত্র পরস্পরের বিরোধী নয়। গণতন্ত্র সেই শাসন ব্যবস্থার নাম, যেখানে জনমতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত, পরিচালিত ও পরিবর্তিত হয়। ইসলামি শাসনব্যবস্থাও তদ্রুপ। তবে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র থেকে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ভিন্ন। কেন না, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র লাগামহীন হয়ে থাকে। জনগণের রায় হালালকে হারাম করে দিতে পারে, যেমন ব্রিটেনে হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে ইসলামি গণতন্ত্র কুরআন ও হাদিস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। গোটা জাতি চাইলেও ইসলামের সীমানার বাইরে গিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সমাজতন্ত্র এর ঠিক বিপরীত। সমাজতন্ত্র একটি জীবনদর্শনের নাম। তার রয়েছে নিজস্ব আকিদা, বিশ্বাস, দর্শন ও নৈতিকতা। ইসলামের সাথে তার কোনোই মিল নেই।[৪]

লন্ডনের 'মাজাল্লাতুন গুরাবা' পত্রিকায় ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> যুগের মানুষদের কথা বুঝানোর জন্য আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করা অপরিহার্য। তবে এগুলো ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোনো কোনো পরিভাষা বর্জন করা ভালো এবং ওয়াজিব, যেমন সমাজতন্ত্র। আর কোনো কোনোটার ব্যবহার এ শর্তে জায়েজ যে তার ইসলামি তাৎপর্য ও পাশ্চাত্য তাৎপর্যের পার্থক্য পুরোপুরি বুঝিয়ে দিতে হবে। যেমন গণতন্ত্র, সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও সংসদীয় পদ্ধতি।[৫]

আমরা এটিও লক্ষ করেছি, পাকিস্তানে যখন বিশ্বের প্রথম ইসলামি সংবিধান রচিত হচ্ছিল তখন তার মধ্যে গণতন্ত্র শব্দটি নেওয়া হয়েছিল আলেমদের সমর্থনে। প্রকৃতপক্ষে একটি আদর্শ প্রস্তাবনা রূপে পাকিস্তানে শাসনতন্ত্রের ভূমিকা আলেমরাই প্রণয়ন করেছিলেন। এ ভূমিকায় গণতন্ত্রের বিষয়টি বলা হয়েছে এভাবে :

> Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam, shall be fully observed.[৬]
>
> গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহনশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার নীতি ইসলামে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে পুরোপুরি সেভাবে মান্য করতে হবে।

অর্থাৎ ইসলাম গণতন্ত্রকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে তা সেভাবে অনুসৃত হবে। এর অর্থ হচ্ছে আলেমগণ, ইসলামি রাজনীতিকগণ শর্তসাপেক্ষে গণতন্ত্র শব্দটি, গণতন্ত্র পরিভাষাটি এবং তা দ্বারা যা বোঝায় তা গ্রহণ করেছেন। আমরা আরো দেখতে পাই যে, আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভি তার 'Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase' গ্রন্থের একটি আলোচনার শিরোনাম করেছেন 'The Movement and Political Freedom and Democracy'. তিনি এতে দেখিয়েছেন যে ইসলাম কোনো স্বৈরাচার এবং রাজতন্ত্র সমর্থন করে না। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, Political Freedom-এর মধ্যেই ইসলাম বিকশিত হয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, যদিও ইসলাম গণতন্ত্র থেকেও ব্যাপক একটি বিষয়, একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, তথাপি তিনি গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেন এবং ইসলামে মানুষের জন্য যেসকল মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা গণতন্ত্রের মাধ্যমেই পূরণ করা সম্ভব। তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে লিখেছেন। তবে যারা ভয় পান যে গণতন্ত্রের নামে ইসলাম বিরোধী আইন প্রণীত হতে পারে, তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য সংবিধানে 'কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন পাশ করা যাবে না' এমন একটি ধারা সংযোজনের তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন :

> However, the tools and guaranties created by democracy are as close as can ever be to the realization of the

> political principles brought to this earth by Islam to put a leash on the ambitions and whims of rulers. These principles are shura (consultation), good advice, enjoining what is proper and forbidding what is evil, disobeying illegal orders, ressisting unbelief and changing wrong by force whenever possible. It is only in democracy and political freedom that the power of Parliament is evident and that people's deputies can withdraw confidence from any govt. that breached the Constitution and it is only such an environment the strength of free press, free Parliament, Opposition and the masses is most felt.[৭]
>
> যাহোক, গণতন্ত্র যেসকল নীতি ও নিশ্চয়তা দান করেছে তা শাসকদের উচ্চাশা ও খেয়ালীপনার উপর একটি নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য ইসলাম পৃথিবীতে যেসব রাজনৈতিক নীতির অবতারণা করেছে তার নিকটতম। এসকল নীতিসমূহ হচ্ছে শূরা, নসিহত, যা সংগত তার আদেশ দেওয়া, যা খারাপ তা বর্জন করা, অবৈধ আদেশসমূহ অমান্য করা, অবিশ্বাস প্রতিরোধ করা এবং যখনই সম্ভব শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবিধান করা। স্বাধীন রাজনৈতিক পরিবেশ এবং গণতন্ত্রেই কেবল সংসদীয় পদ্ধতির বৈধতা ও ক্ষমতা স্বীকৃত এবং জনগণের প্রতিনিধিগণ যে কোনো সরকারের উপর সংবিধান লংঘনের অপরাধে অনাস্থা জ্ঞাপন করতে পারে এবং এটি (গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা) এমন একটি পরিবেশ যেখানে স্বাধীন সংবাদপত্র, নিরপেক্ষ সংসদ, বিরোধী দলের অবস্থান এবং জনসাধারণের মতামত সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিফলিত।

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ করা যায় যে, ইসলামি চিন্তাবিদ ও মুসলিম জনগণ ভোটাধিকার, আইনের শাসন এবং জনগণের নির্বাচিত সরকারই চায়। এসব বোঝাবার জন্যই আজকাল 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সার্বিক প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে 'গণতন্ত্র' শব্দ গ্রহণ করার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। পাশ্চাত্যে ইসলাম সম্পর্কে যেসব ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে, যেমন– ইসলাম আগ্রাসী এবং একনায়কত্ববাদী (Violent, Authoritarian)– এর ফলে এসব দূর হবে। মুসলিম বিশ্বেও এর ফলে রাজা-বাদশাহ ও স্বৈরশাসকগণ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন শাসনতন্ত্রে ব্যবহার ছাড়াও ইসলামি চিন্তাবিদগণ ইতোমধ্যেই 'গণতন্ত্র' পরিভাষাটি গ্রহণ করেছেন। এটি সংগত। আমরা আশা করি এ আলোচনা 'গণতন্ত্র'-এর পরিভাষা সম্পর্কে বিতর্ক দূর করতে সহায়তা করবে।

তথ্যসূত্র

১. ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, লাহোর ১৯১০-১৯১১, 'মহাকবি ইকবাল', ড. আবু সাঈদ নূরুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ২৩৪।
২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৩৫।
৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৩৯।
৪. মাওলানা মওদূদীর সাক্ষাৎকার, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২৬৩।
৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৫৫।
৬. ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা।
৭. ড. ইউসুফ আল কারযাভি প্রণীত 'Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase' গ্রন্থের 'The Movement and Political Freedom and Democracy' শীর্ষক আলোচনা।

ইসলামে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতায়ন

সমাজে নারীর অবস্থান এবং অধিকার নিয়ে আমরা নানা কথা শুনে থাকি। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বর্তমানে যে কথাগুলো বলা হয়, তার মধ্যে অনেকগুলোই গ্রহণযোগ্য। আবার কিছু কিছু কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ আছে। নারী-পুরুষ সকলেরই অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়া অনস্বীকার্য। কারণ, সমাজ দিনে দিনে সামনে এগুচ্ছে। তাই শুধু নারী বা শুধু পুরুষের নয় বরং সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

গত পঞ্চাশ বছরে সমাজ অনেকটা এগিয়েছে। এ সময়ে পুরুষের সাথে নারীরাও, সমান না হলেও, এগিয়ে এসেছে। বেগম রোকেয়ার সময়ে যে সমাজ ছিল, সে সমাজকে আমরা অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। তিনি দেখেছিলেন যে, সে সময়ে মেয়েরা লেখাপড়ার কোনো সুযোগই পেত না। সে সময়ে বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার ব্যাপারে সাহসী উদ্যোগ না নিলে আজ এ উপমহাদেশের নারীরা কেউই কিন্তু পড়ালেখা শিখতে পারতেন না। সারা পৃথিবীতে, বিশেষ করে আমাদের দেশে মানুষের উপর; বিশেষ করে নারীর উপর যে অত্যাচার চলছে তার একটা ফাউন্ডেশন আছে, ভিত্তি আছে। অত্যাচারটা আকাশ থেকে আসছে না। নারীর উপরে পুরুষের এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর যে অত্যাচার, তার আইডিওলজিক্যাল ফাউন্ডেশনটা (Ideological Foundation) হলো– সাধারণভাবে মানুষ বিশ্বাস করে, বিশেষ করে পুরুষরা বিশ্বাস করে যে নারী পুরুষের চেয়ে ছোট, তাদের 'কোয়ালিটি খারাপ এবং তারা নিচু। এই বিশ্বাস অবশ্য নারীর মধ্যেও কিছুটা বিদ্যমান। মানুষের মধ্যে কতগুলো বিভ্রান্তি থেকে এ বিশ্বাসের জন্ম। আর এই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে নারীদের প্রতি অবহেলা, বঞ্চনা এবং নির্যাতন।

আমাদের দেশ থেকে যদি নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হয়, তবে ইসলামকে বাদ দিয়ে তা করা যাবে না। আমি এটি খুব পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, ইসলামকে বাদ দিয়ে আমাদের মতো শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশে চলা যাবে না। যারা ইসলাম থেকে বিদ্রোহ করেছে তারা কিন্তু টিকতে পারে নি, পারছে না। যারা বিদ্রোহ করেছিলেন তাদের পরিণতি ভালো হয় নি, খারাপ হয়েছে। আমি বিনীতভাবে বলতে চাই যে, ইসলামের কাঠামোর মধ্যে আমরা যদি এগুতে পারি, তবে তা সবচাইতে ভালো হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ইসলামে এরকম একটি ফ্রেমওয়ার্ক আছে, যা নারীদের সামনে এগিয়ে দিতে পারে। আমি ইসলামের কোনো সাময়িক (Temporary) ব্যাখ্যা দেয়ার পক্ষে নই। সত্যিকার অর্থেই ইসলাম নারীকে ক্ষমতায়িত করেছে এবং নারীকে সম্মানিত করেছে, নারীকে অধিকার দিয়েছে। সেগুলো ব্যাখ্যা করার আগে আমি 'আইডিওলজিক্যাল ফাউন্ডেশন'-এর নতুন ভিত্তি যেটি হতে পারে সেটি বলতে চাই।

কী সেই ভিত্তি যে ভিত্তির ওপর নারী পুরুষের মৌলিক সাম্য বিদ্যমান? আল্লাহ মানুষের চেহারা এক রকম করেন নি। সকল দিক থেকে, In every dot যেকোনো দুটি মানুষ সমান নয়। ওজন, উচ্চতা, রঙ, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছুতে একটি মানুষ থেকে আরেকটি মানুষ আলাদা। কিন্তু মৌলিকভাবে প্রতিটি মানুষ সমান। আল্লাহর কাছে সমান। তার চারটি প্রমাণ আমি আপনাদের দিচ্ছি।

প্রথমত, আল্লাহ তায়ালা এ কথা খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, মূল মানুষ হচ্ছে 'রুহু'। যাকে আমরা আত্মা বলি। মূল মানুষ কিন্তু শরীর নয়। দেহ তো কবরে পচে যাবে। আমরা যারা ইসলামে বিশ্বাস করি তারা জানি, মূল মানুষ হলো 'রুহু'। আল্লাহ সকল মানুষকে, তার রুহুকে একত্রে সৃষ্টি করেন, একই রকম করে সৃষ্টি করেন এবং একটিই প্রশ্ন করেন। আল্লাহর প্রশ্নের উত্তরও নারী-পুরুষ সকলে একই দিয়েছিল। সূরা আরাফের একটি আয়াত হলো :

> স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই তুমি আমাদের প্রতিপালক, আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি।' এটা এজন্য যে তোমরা যেন কেয়ামতের দিন না বলো, 'আমরা তো এ বিষয়ে জানতাম না।' (সূরা আরাফ : আয়াত ১৭২)।

তার মানে আল্লাহর সঙ্গে একটি পয়েন্টে সকল নারী এবং পুরুষের একটি চুক্তি হলো যে, আপনি আমাদের প্রভু, আমরা আপনাকে মেনে চলবো। এক্ষেত্রে পুরুষের চুক্তি আলাদা হয় নি। নারীর চুক্তি আলাদা হয় নি। সুতরাং আমরা দেখলাম, আমাদের Ideological Foundation-এর প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, মূল মানুষ হচ্ছে 'রুহু' এবং তা সমান। এই সাম্যের পরে যদি কোনো অসাম্য থেকে থাকে তাহলে তা অত্যন্ত নগণ্য, Insignificant, very small. তার মানে হচ্ছে, মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এক এবং সে মানুষ হিসেবে এক। এটি হলো নারী-পুরুষের সাম্যের প্রথম ভিত্তি।

দ্বিতীয়ত, আমরা পুরুষরা গর্ব করি যে, আমাদের শারীরিক গঠন বোধহয় নারীর তুলনায় ভালো, আল্লাহ বোধহয় আমাদেরকে তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠ করে বানিয়েছেন এবং মেয়েরা আনকোয়ালিফায়েড বা অযোগ্য। কিন্তু আল্লাহ একটি কথা কুরআনে খুব পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, সকল মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু প্রতিটি মানুষ ফার্স্ট ক্লাস। যারা নামাজ পড়েন তারা এই আয়াত জানেন, সুরা 'তীন'-এ আল্লাহ বলেছেন :

> নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে, সর্বোত্তম কাঠামোয়। (সূরা তীন : আয়াত ৪)।

এখানে পুরুষকে বলেন নি। তার মানে আমাদের গঠনে পার্থক্য আছে, আমরা এক নই, আমরা ভিন্ন কাঠামোর। কিন্তু সবাই ফার্স্ট ক্লাস। সুতরাং নারী-পুরুষের মৌলিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য, নতুন নারী আন্দোলনের জন্য অথবা নতুন মানব

আন্দোলনের জন্য এটি দ্বিতীয় ভিত্তি। পুরুষদের একথা বলা ঠিক হবে না যে, মেয়েদের স্ট্রাকচার খারাপ। আল্লাহ তাতে অসন্তুষ্ট হবেন। যারা মোমেন, যারা বিশ্বাসী– তারা এ কথা বলবেন না। সুতরাং নারী-পুরুষের মৌলিক সাম্যের এটি হলো দ্বিতীয় প্রমাণ। মৌলিক এ কারণে বলছি যে, নারী-পুরুষের মধ্যে ছোটখাটো পার্থক্য বিদ্যমান।

তৃতীয়ত, আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সকল মানুষ এক পরিবারের। আদম এবং হাওয়ার পরিবারের। সূরা নিসার প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলছেন :

> হে মানব জাতি, সেই রবকে তুমি মানো যিনি তোমাদেরকে একটি মূল সত্তা (নফস) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সত্তা থেকে তার সঙ্গীকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই দুজন থেকে তিনি অসংখ্য নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নিসা: আয়াত ১)।

তার মানে আমরা এক পরিবারের। আমরা হচ্ছি বনী আদম। আদমের সন্তান। আল্লাহ পাক কুরআনে অন্তত ২০/৩০ বার বলেছেন 'ইয়া বনী আদামা' (হে আদমের সন্তানেরা)। বাপ-মা এবং সন্তানেরা মিলে যেমন পরিবার তৈরি হয়, তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতি একটি পরিবার। সব পরিবারের ওপরে হলো মানব জাতির পরিবার। তার মানে আমাদের মৌলিক যে সম্মান ও মর্যাদা তা সমান। ছোটখাটো কারণে আমাদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। তবে জাগতিক মর্যাদা আসল মর্যাদা নয়।

আইনের ভাষায় যেমন বলা হয়, আইনের চোখে সকল মানুষ সমান, তেমনি আল্লাহর কাছেও সবাই সমান। আল্লাহর কাছে সম্মানের একমাত্র ভিত্তি হলো তাকওয়া। আল্লাহ বলেন নি যে, তার কাছে পুরুষ সম্মানিত বা নারী সম্মানিত। আল্লাহ বলেছেন :

> তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত : আয়াত ১৩)।

আল্লাহর কাছেই যদি মর্যাদার এই ভিত্তি হয়, তাহলে মানুষের পার্থক্যে কি কিছু যায় আসে? আল্লাহ বলেছেন তিনি তাকওয়া ছাড়া (আল্লাহকে কে মানে আর কে মানে না) কোনো পার্থক্য করেন না। অতএব আমরা এক পরিবারের সন্তান, আমাদের মৌলিক মর্যাদা সমান।

কুরআনের সূরা নিসার একটি আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ বলেছেন :

> এবং ভয় পাও সেই আল্লাহকে, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবি করে থাকো এবং ভয় পাও গর্ভকে বা মাকে। (সূরা নিসা : আয়াত ১)।

আল্লাহ বলেছেন গর্ভকে ভয় পাও। কুরআনের এই আয়াতটির তাফসিরে মিশরের বিখ্যাত আলেম সাইয়েদ কুতুব লেখেন, 'এই ভাষা পৃথিবীর কোনো সাহিত্যে

কুরআনের আগে লেখা হয় নি। আল্লাহ্ গর্ভকে ভয় করতে বলে মাকে সম্মান করার কথা বলেছেন, নারী জাতিকে সম্মান করার কথা বলেছেন।' (সূরা নিসার তাফসির-সাইয়েদ কুতুব)। সুতরাং আমাদের মৌলিক সামাজিক মর্যাদা এক্ষেত্রেও সমান বলে প্রতীয়মান হলো। এটি আমাদের নতুন আইডিওলজিক্যাল ফাউন্ডেশনের তৃতীয় প্রমাণ।

চতুর্থত, আল্লাহতায়ালা মানুষকে সৃষ্টির সময় বলে দিলেন যে, 'তোমরা সবাই খলিফা'। তিনি বললেন, 'ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদে খলিফা'। আল্লাহ্ বলেন নি যে, তিনি নারী পাঠাচ্ছেন বা পুরুষ পাঠাচ্ছেন। এমনকি তিনি বলেন নি যে, তিনি মানুষ পাঠাচ্ছেন; আল্লাহ্ বললেন, তিনি খলিফা পাঠাচ্ছেন। পাঠালেন মানুষ, বললেন খলিফা। মানুষকে তিনি খলিফা নামে অভিহিত করলেন। খলিফা মানে প্রতিনিধি। আমরা পুরো মানব জাতি হচ্ছি আল্লাহর প্রতিনিধি। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে আমরা প্রত্যেকে তাঁর প্রতিনিধি– আল্লাহর প্রতিনিধি। তবে এ কথা ঠিক যে, যদি আমরা গুনাহ করি, অন্যায় করি, খুন করি, অত্যাচার করি, জুলুম করি, ঈমান হারিয়ে ফেলি– তাহলে আমাদের খলিফা মর্যাদা থাকে না। কিন্তু মূলত আমরা আল্লাহপাকের খলিফা। (দ্রষ্টব্য : সূরা বাকারা : আয়াত ৩০, সূরা ফাতির : আয়াত ৩৯)।

এই খলিফার মর্যাদার মধ্যেই রয়েছে সকল ক্ষমতায়ন– যে ক্ষমতায়নের কথা আমরা বলি। ক্ষমতা ছাড়া কেউ কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারে না। খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে গেলে প্রত্যেক নারী এবং পুরুষের কিছু ক্ষমতা লাগবে। নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি এই খেলাফতের মধ্যে রয়েছে। শুধু নারী নয়, খেলাফত শব্দের মধ্যে নারী, পুরুষ, গরীব, দুর্বল সকলের ক্ষমতায়নের ভিত্তি রয়েছে। সুতরাং নারী-পুরুষ মৌলিক সাম্যের এটি হলো চতুর্থ প্রমাণ।

ইসলাম চায় প্রত্যেককে ক্ষমতায়িত করতে (Every man, every woman, every person should be empowered)। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি নারীরা বঞ্চিত থেকে থাকে, তবে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করতে হবে। পুরুষরা কোনোদিন বঞ্চিত হলে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করতে হবে। তবে যে বঞ্চিত তার কথা আমাদেরকে আগে ভাবতে হবে, নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য বর্তমানে আমাদের আগে কাজ করতে হবে।

আজকে মেয়েদের আসল কাজ কী তা নিয়ে কথা উঠছে। তারা কি ঘরে বসে থাকবে– এমন প্রশ্ন উঠছে। কোনো মেয়ে যদি তার স্বাধীন সিদ্ধান্তে ঘরে থাকতে চায়, তবে তার সেটি করার অধিকার আছে। পুরুষের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য। কিন্তু আল্লাহ কোথাও বলেন নি যে নারীদের ঘরে বসে থাকতে হবে, বাইরের কাজ নারীরা করতে পারবে না। বরং আল্লাহ্ মূল দায়িত্ব নারী পুরুষের একই দিয়েছেন। সূরা তাওবার ৭১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, নারী-পুরুষের দায়িত্ব ৬টি। আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'মোমেন পুরুষ এবং মোমেন নারী একে অপরের অভিভাবক (ওয়ালী), একে অপরের বন্ধু, একে অপরের সাহায্যকারী।' (সূরা তাওবা: আয়াত ৭১)।

এই আয়াত কুরআনের সর্বশেষ সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখিত বিষয়ে আগে যেসকল আয়াত আছে সেগুলোকে এই আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই আয়াতে বলা আছে যে, নারী-পুরুষ একে অপরের অভিভাবক, গার্জিয়ান। অনেকে বলেন যে, নারী গার্জিয়ান হতে পারে না; কিন্তু আল্লাহ বলেছেন নারী গার্জিয়ান হতে পারে। কুরআনে এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। নারী-পুরুষের নির্ধারিত ৬টি দায়িত্ব হচ্ছে :

১. তারা ভালো কাজের আদেশ দিবে।
২. মন্দ কাজের ব্যাপারে নিষেধ করবে।
৩. উভয়ে নামাজ কায়েম করবে।
৪. জাকাত দিবে।
৫. আল্লাহকে মানবে।
৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানবে।

এসব কথার মাধ্যমে আল্লাহ নারীদের সকল ভালো কাজে অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। এটিই ইসলামের নীতি। এ বিষয়ে আল্লাহ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যারা এই ৬টি দায়িত্ব পালন করবে তাদের উপর আল্লাহতায়ালা রহমত করবেন। কুরআনের বেশ কয়েকটি তাফসির পড়ে এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলে পুরোপুরি বিশ্বাসী একজন মানুষ হিসেবে আমি বিশ্বাস করি যে, এই ৬টি দায়িত্বের মধ্যে নারী-পুরুষ সবাই সমান। রাজনীতি, সমাজসেবা, ইত্যাদি সব কাজই এ ৬টির আওতায় পড়ে।

আজ আমরা ইসলামের মূল জিনিস পরিত্যাগ করে ছোটখাটো জিনিস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। মানুষের তৈরি বিভিন্ন কিতাবের ওপর নির্ভর করছি। আল্লাহর মূল কিতাবকে আমরা সেই তুলনায় গুরুত্ব দিচ্ছি বলে মনে হচ্ছে না। এখানে একটি কথা বলা দরকার, ইসলামকে কেউ যদি অন্যের মাধ্যমে শেখেন তবে তারা কখনো মুক্তি পাবেন না। তাই প্রত্যেককে কুরআনের পাঁচ ছয়টি তাফসির নিজে পড়তে হবে। অনেকে অনুবাদের মধ্যে তাদের নিজেদের কথা ঢুকিয়ে দেন। ফলে পাঁচ-ছয়টি তাফসির পড়লে আমরা বুঝতে পারবো কোথায় মানুষের কথা ঢুকেছে; আর আল্লাহর কথাটা কী? কয়েক রকম ব্যাখ্যা পড়লে আমরা ঠিক করতে পারবো, কোন ব্যাখ্যাটা ঠিক। মেয়েদের মধ্যে বড় তাফসিরকারক হয় নি। মেয়ে তাফসিরকারক থাকলে হয়তো লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব (Gender Bias) হতো না। তবে কুরআনের কিছু তাফসির আছে যেগুলো লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব মুক্ত (Free from gender bias); যেমন মোহাম্মদ আসাদের 'দি ম্যাসেজ অব দি কুরআন'।

ইসলামি অর্থনীতি ঃ দর্শন ও কর্মকৌশল

ইসলামি অর্থনীতি বর্তমানে একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে, অর্থনীতি সাবজেক্টের বয়সও খুব বেশি নয়। মাত্র আশি বা নব্বই বছর। এর পূর্বে এটি পলিটিক্যাল সায়েন্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন এটিকে পলিটিক্যাল ইকোনমি (Political Economy) বলা হতো।

গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে ইসলামি অর্থনীতির উপর ব্যাপক কাজ হচ্ছে। বেশকিছু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সিনিয়র অর্থনীতিবিদ এই বিষয়ে কাজ করছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রফেসর খুরশিদ আহমদ, ড. নাজাত উল্লাহ্ সিদ্দিকী, প্রফেসর ড. ওমর চাপরা, ড. মনজের কাহাফ, ড. তরিকুল্লাহ্ খান, ড. মুনাওয়ার ইকবাল প্রমুখ। এছাড়াও অন্য স্কলাররা এই বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন। আস্তে আস্তে ইসলামি অর্থনীতি একটি পূর্ণ বিজ্ঞানে (Science) পরিণত হয়েছে।

ইসলামি অর্থনীতির ওপর আলোচনা করতে গেলে ইসলামি অর্থনীতির যে দর্শন বা স্ট্র্যাটেজি সেই বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। ইসলামি অর্থনীতির দর্শন হলো এই অর্থনীতির ভিত্তি অথবা তার স্ট্র্যাটেজি বা কর্মকৌশলের ভিত্তি। কেন না, একটি বিল্ডিং যেমন নির্ভর করে তার ফাউন্ডেশনের ওপর, ফাউন্ডেশনটাই বলে দেয় বিল্ডিংটি কী রকম হবে, তেমনিভাবে ইসলামি অর্থনীতির দর্শন বলে দেয় যে, তার স্ট্র্যাটেজিটা কী হবে বা কী হওয়া উচিত। কিন্তু সেই দর্শন এবং কর্মকৌশল আলোচনার পূর্বে আমি মনে করি বর্তমান বিশ্বে যা চলছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। বর্তমানে বিশ্বের সর্বাধিক চলিত (Ruling) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে ক্যাপিটালিজম (Capitalism)। আমরা যদি এই ক্যাপিটালিজমের সমস্যাগুলো বুঝতে পারি তা হলেই ইসলামি অর্থনীতির গুরুত্ব বুঝতে পারব। এটি এই জন্যেই প্রয়োজন যে, বর্তমান রুলিং আইডিওলজি (Ruling Ideology) দৃশ্যত খুব শক্তিশালী, খুব সফল বলে মনে হয়। অনেকের এও মনে হতে পারে যে, এর বুঝি কোনো দুর্বলতা নেই। কিন্তু এ কথাটা সত্য নয় এবং এ কথাটাই আমি এখানে আলোচনা করতে চাই।

ক্যাপিটালিজমের বয়স ষোড়শ শতাব্দী থেকে ধরা হয়। প্রায় পাঁচশ বছর এর বয়স। এই পাঁচশ বছরে ক্যাপিটালিজম যে দুনিয়ায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে তা অস্বীকার করা যাবে না, তেমনি এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, ক্যাপিটালিজম বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য (Poverty), অসমতা (Unequality) দূর করতে পারে নি। কাজেই, ক্যাপিটালিজম দোষমুক্ত বা সমস্যামুক্ত এটি যেমন অতীতের ক্ষেত্রে বলা যায় না, তেমনি আজকেও বলা যায় না।

আমরা গত বিশ-পঁচিশ বছরে পুঁজিবাদী বিশ্বের অনেক সংকট দেখেছি। সাউথ ইস্ট এশিয়ায় বিরাট অর্থনৈতিক ক্রাইসিস দেখলাম বিগত শতাব্দীর একেবারে

শেষের দিকে এবং সেটি এখনো চলছে। ল্যাটিন আমেরিকাতেও আমরা বিভিন্ন সময় ক্রাইসিস দেখেছি। ২০০৮ সন থেকে চলছে বিশ্বজোড়া নতুন করে অর্থনৈতিক সংকট।

ক্যাপিটালিজম আমরা কমবেশি সবাই বুঝি। বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতবাদ প্রধানত পাশ্চাত্যেই তৈরি হয়েছে এবং ডেভেলপ করেছে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরাই এর ওপর বেশি কাজ করেছেন। এ কথাগুলো শুধু ক্যাপিটালিজমের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, সোশ্যালিজমের ক্ষেত্রেও সত্য। ওয়েলফেয়ার ইকোনমিকস (Welfare Economics) নামে যা বিশ্বে চলছে, সেটিও পাশ্চাত্যেরই অবদান। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরাই এসব ধারণা নিয়ে আসছেন।

ক্যাপিটালিজমের ভিত্তি ছিল বা এর পেছনে শুরুতে কাজ করত খ্রিস্টান এথিকস বা খ্রিস্টান নৈতিকতা। কারণ, পাশ্চাত্যের যেখানে এর বিকাশ ঘটে সেই সমাজ মূলত খ্রিস্টান সমাজ ছিল। মৌলিকভাবে জনগণ খ্রিস্টীয় এথিকসে বিশ্বাস করত। ফলে ক্যাপিটালিজমের অর্থনৈতিক নীতিমালায় যা-ই ত্রুটি থাকুক না কেন, খ্রিস্টান এথিকস তাকে মডারেট করতো, তার খারাপ প্রভাবকে সংযত করত, তাকে নিয়ন্ত্রণ করত।

পরবর্তীকালে কোনো কোনো লেখকের দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুক্তবুদ্ধির (Enlightenment) যে আন্দোলন শুরু হয় তার মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মকে জীবনের মৌলিক কর্মকাণ্ড থেকে বাদ দেয়ারও চেষ্টা করা হলো। এই আন্দোলনের কারণে বাস্তবে সেকুলারিজম প্রাধান্য পায় এবং সমাজ সেক্যুলারিস্ট হয়। সেখানে মোরালিটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং যুক্তিকে (Reason) প্রাধান্য দেয়া হয়। এতে মনে করা হলো যুক্তিই সবকিছুর সমাধান করতে পারে। যদিও আমরা জানি, যুক্তিবাদে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। এর দ্বারা সব সমাধান করা যায় না। যুক্তিবাদ সত্ত্বেও মানুষের ভিতর মতবিরোধ দেখা দেয় এবং আজকে যেটি যুক্তিসংগত মনে হয় কালকে সেটি যুক্তিসংগত থাকে না। এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটি সময় গেছে যখন রিজনকে প্রায় পূজা করা হতো। আল্লাহর স্থানে, গডের স্থানে রিজনকে নিয়ে আসা হলো। সেটি ভ্রান্ত ছিল, বিভ্রান্তি ছিল, ভুল ছিল।

এনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্টের কারণে (ক্যাপিটালিজমের ভিত্তি হওয়ার কারণে বা এর ফল স্বরূপ) চলে আসল ম্যাটেরিয়ালিজম (Materialism)– ভোগবাদ, ব্যক্তিবাদ, স্বার্থপরতার মতো বস্তুবাদের বিষয়সমূহ। এর ফলে আসে বেশি হাই কনজাম্পশান। অন্যদিকে এটি একটি সামাজিক ডারউইনিজম সৃষ্টি করল। আমরা ডারউইনিজম সম্পর্কে জানি। ডারউইনিজম হচ্ছে, জীব জগতের যে ধারণা ডারউইন থেকে এসেছে বা ডারউইন উদ্ভাবন করেছেন (Natural selection and survival of the fittest)। অর্থাৎ জীবজগত সম্পর্কিত ডারউইনের ধারণাই ডারউইনিজম। এখন সোশ্যাল ডারউইনিজম অর্থাৎ সামাজিক ক্ষেত্রেও ডারউইনিজম বিশ্বব্যাপী এত গুরুত্ব পেয়েছে এনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্ট এবং ম্যাটেরিয়ালিজমের বিকাশের কারণে। ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে এই ধারণা সৃষ্টি

হয় যে, অর্থনীতিতেও Natural Selection হবে এবং এখানে শুধু ফিটেস্টরাই সারভাইভ করবে– যোগ্যরাই বাঁচবে। অর্থনীতিতে, যদি তা-ই হয়, তাহলে তার মানে হবে প্রকৃতপক্ষে দুর্বলের কোনো স্থান থাকবে না, দরিদ্রের স্থান থাকবে না। যদি থাকেও তাহলে তাদের খুব সংকীর্ণ স্থান থাকবে।

সোজা কথা, বিশ্ব অর্থনীতি ধনীদের, যোগ্যের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। অর্থাৎ ম্যাটেরিয়ালিজম, এনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্ট ও সোশ্যাল ডারউইনিজমের কারণে পুঁজিবাদ একটি ডকট্রিনে পরিণত হয়। অর্থনীতিতে শুধু যোগ্যরাই টিকে থাকবে– সেটাই একটি মতাদর্শে বা দর্শনে পরিণত হয়। এতে দরিদ্রের প্রতি খ্রিস্টান এথিকসের কারণে যে মায়া-মহব্বত ছিল, তাদের প্রতি যে দায়িত্ববোধ ছিল, সেটি উঠে গেল। এমনকি দর্শনের মাধ্যমে সেটি উঠে গেল। তখন তারা দরিদ্র মারা গেলে কী হবে সে যুক্তি খাড়া করতে পারল না। যোগ্যদের টিকে থাকার ফলে দরিদ্ররা মরে যাবে। এই ধরনের ফলাফল অষ্টাদশ শতাব্দীর মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের কারণে দেখা দিয়েছিল।

ক্যাপিটালিজমের থিওরির পেছনে কতগুলো অগ্রহণযোগ্য ধারণা (Concepts) ছিল যেগুলো আমাদের জানা দরকার। এগুলো প্রকৃতপক্ষে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন প্রথমত, অর্থনীতির আইনগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল ল'-এর মতো। যেমন যেভাবে পৃথিবী ঘুরছে বা সূর্য যেভাবে চলছে নিজস্ব নিয়মে অথবা বায়ু প্রবাহ, নদী বা সমুদ্রের গতি প্রভৃতি ফিজিক্যাল ল'জ যেমন সঠিক তেমনি ইকোনমিক ল'জ সঠিক। এখানে অর্থনীতির আইন ফিজিক্যাল আইনের মতোই– এরকম একটা ধারণা নিয়ে আসা হলো। তারা এগুলো বিশ্বাস করেন। কিন্তু এটি একেবারে সত্য নয়। আমরা জানি, বাজার ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকে। যেই পরিবর্তন আমাদের সোলার (Solar) সিস্টেমে হয় না বা আমাদের ফিজক্যাল ল'তে হয় না। অথচ যেকোনো বাজার ব্যাপক পরিবর্তনের সম্মুখীন। সুতরাং এ রকমই একটি ভুল ধারণার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপিটালিজম।

দ্বিতীয়ত, মানুষের কাজের মোটিভেশন বা কাজ করার প্রেরণাটা কী সে সম্পর্কে তারা বলে, মানুষের কাজের মোটিভেশন হলো শুধু তার স্বার্থপরতা (Pecuniary Interest)। মানুষ মূলত স্বার্থপর এবং তার স্বার্থপরতা, স্বার্থ উদ্ধার করাই হচ্ছে তার প্রকৃত মোটিভেশন। এটিকেই তারা টেকনিক্যালি বলে Rational Economic Man। মানুষ হচ্ছে যুক্তিবাদী (Rational)। এ যুক্তির পরিচয় হচ্ছে সে স্বার্থের জন্য কাজ করে। তবে একথা ঠিক যে, মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা রয়েছে এবং স্বার্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে মানুষ কেবল স্বার্থের জন্যেই কাজ করে এ কথা সত্য নয়। তাহলে দুনিয়ায় এত ত্যাগ (Sacrifice) মানুষ করতে পারত না। পরিবারের জন্যে, সমাজের জন্যে মানুষ এত ত্যাগ করত না। এত চ্যারিটি দুনিয়াতে থাকত না।

তৃতীয়ত, তারা একটি মূল্যবোধহীন অর্থনীতির জন্ম দিলেন। তারা একটি ডকট্রিন দাঁড়া করালেন পজিটিভিজম (Positivism) নামে। পজিটিভিজম হলো, অর্থনীতিতে কোনো মূল্যবোধ নেই। অর্থনীতিতে মূল্যবোধ এলেই অর্থনীতি

প্রভাবিত হয়ে যাবে। অর্থনীতি তার ন্যাচারাল কোর্স থেকে সরে পড়বে। অর্থনীতি একটি বিজ্ঞান হিসেবে থাকবে না। কিন্তু অর্থনীতির কার্যক্রমে কোনো মূল্যবোধ থাকবে না এরকম দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত মারাত্মক। আর তা-ই যদি হয় তাহলে কোন যুক্তিতে আমরা দরিদ্রের জন্য কাজ করব? দারিদ্র্য কেন দূর করব? কেন আমরা নিরক্ষরতা দূর করব? কেন আমরা বঞ্চিত জনগণের জন্য কাজ করব? এ সবই তো মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত।

সুতরাং পজিটিভিজম ধারণা ক্যাপিটালিজমে প্রবেশ করাল যে, অর্থনীতিতে কোনো মূল্যবোধ নেই। ক্যাপিটালিজমের অপর নাম মূল্যবোধহীন অর্থনীতি। এটি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না অথচ এটিই চলছে ক্যাপিটালিজমের নামে। আবার বলা যায়, পুরোপুরি চলছে না। কারণ, মানুষের মানবিকতা কখনো কখনো এসব বিষয় কার্যকর হতে দেয় না। কারণ এগুলো সব আন-ন্যাচারাল বা অস্বাভাবিক ধারণা। এজন্যে হয়ত বা এগুলো থিওরিতে আছে তবে বাস্তবে তা পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভব হয় না।

চতুর্থত, ক্যাপিটালিজম মার্কেট সিস্টেমের উপর গুরুত্ব দেয়। মার্কেট সিস্টেমের গুরুত্ব সত্ত্বেও তার অনেক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সেটি তারা স্বীকার করেন না। ক্যাপিটালিজমের মার্কেট সিস্টেমের অনেক ভালো দিক আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এলোকেশন অব রিসোর্সের ক্ষেত্রে মার্কেট একটি ভালো কাজ করে। কিন্তু আমাদের এটি মনে রাখতে হবে যে, ক্যাপিটালিজমে মার্কেট সিস্টেমটাকে যে রকম পুরোপুরি পারফেক্ট মনে করা হয় তা কিন্তু সত্য নয়। বাস্তবে মার্কেট সিস্টেমের মাধ্যমে পুরোপুরি রিসোর্স বা সম্পদের সঠিক বন্টন (Proper Allocation) হয় না। ন্যায়বিচারমূলক বন্টন হয় না। তার প্রমাণ বাস্তবে একটি দেশে জনগণের একটি অংশের হাতে প্রয়োজনীয় ক্রয় ক্ষমতা না থাকায় তারা কিনতে পারে না। যেমন, আমাদের দেশে অর্ধেকের বেশি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন। তাদের কাছে ডলার বা পাউন্ড নেই। তারা কিনতে পারেন না। তারা অর্থের অভাবে প্রয়োজনীয় জীবন সামগ্রী কিনতে পারেন না বলে তাদের প্রয়োজনটা মার্কেটেই যায় না, যেতেও পারে না। তাদের দুধ বা ওষুধ দরকার হলেও সেই প্রয়োজন মার্কেটে আসছে না। তাদের বাড়ি দরকার, বাড়ি ভাড়া করা দরকার– সেই প্রয়োজন মার্কেটে যায় না। কারণ, তারা সেটি কিনতে পারছেন না।

অন্যদিকে মার্কেট সিস্টেমে যাদের টাকা আছে তারা চারটা-পাঁচটা গাড়ি কিনতে পারেন। বিরাট বিরাট বাড়ি বানাতে পারেন। অন্যদিকে যাদের টাকা নেই তারা দুধ পর্যন্ত কিনতে পারেন না। ওষুধ কিনতে পারেন না। এই পরিস্থিতিতে দু'টো ফল জনগণের হয়। প্রথমত, পূর্ণ ও সঠিক ডিমান্ডটা মার্কেটে আসতে পারে না বর্তমান মার্কেট সিস্টেমের কারণে এবং দ্বিতীয়ত অগ্রাধিকার (Priorities) নষ্ট হয়ে যায়। দরকার দুধের অথচ মার্কেট বলছে বিলাস সামগ্রী বানাও। কেননা Price Mechanism-এর মাধ্যমে বাজারে সেসব দ্রব্যের চাহিদা এসেছে। গাড়ির চাহিদাটাই মার্কেটে আসছে। দুধের চাহিদা আর আসতে পারছে না।

সুতরাং মার্কেট সিস্টেম সঠিক পদ্ধতি নয় যার মাধ্যমে সম্পদের সমবণ্টন হতে পারে। কেন না, সম্পদ চলে যাবে সেদিকে, যেদিক থেকে মার্কেটে ডিমান্ড আসছে। সম্পদ সেদিকেই যাবে, যে ডিমান্ডটি মার্কেটে আসে। ফলে যে ডিমান্ড আসছে না (দুধের ডিমান্ড পুরোপুরি আসছে না) সেদিকে তো সম্পদ যাচ্ছে না। এরকম প্রচণ্ড ইমপারফেকশন (Imperfection) মার্কেট সিস্টেমে রয়েছে। সুতরাং যারা মনে করেন মার্কেট সব সমস্যার সমাধান করবে তারা সম্পূর্ণ ভুল করেন, মার্কেটের দাস (Servant) হয়ে যান। কিন্তু সেটি হওয়া ঠিক হবে না। বাজার গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বাজার একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়।

এই কনটেক্সটে (Context) এখন ইসলামের অর্থনীতির যে মূল ভিত্তি বা তার যে স্ট্র্যাটেজি সে সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। বর্তমানে রুলিং আইডিওলজি ক্যাপিটালিজমের দুর্বলতা বোঝার কারণে ইসলামি অর্থনীতির কর্মকৌশল ভালো করে বোঝা সম্ভব। ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ তিনটি বিষয় বা কনসেপ্টকে মূল ভিত্তি বলেছেন। প্রথম ভিত্তিটি হলো তৌহিদ। এই তৌহিদ হচ্ছে পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন– এটা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি নয়; সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি, সকল মানুষের গুরুত্ব রয়েছে এবং সকল মানুষকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ইসলামি অর্থনীতির দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে খিলাফত। খিলাফত হলো– মানুষ আল্লাহর খলিফা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই। সূরা বাকারা, সূরাতুল ফাতিরে এবং অন্যান্য সূরাতে একথা বলা হয়েছে। খিলাফত মানুষকে অত্যন্ত সম্মানিত করেছে। মানুষ কোনো চান্স প্রোডাক্ট (Chance Product) নয়। হঠাৎ করে একটি এক্সিডেন্টের মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টি– সে রকম নয়। মানুষ জন্মগত অপরাধীও (Born Sinner) নয় যেমনটি পাশ্চাত্যে মনে করা হয়। খিলাফতের ধারণা মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। খিলাফতের তাৎপর্য হলো বিশ্বভ্রাতৃত্ব (Universal Brotherhood)। অর্থাৎ সকল মানুষ ভাই বা ভাই-বোন এবং এ হিসেবে তারা মর্যাদার অধিকারী, সমতার অধিকারী, সমভাবে তাদের দিকে খেয়াল করতে হবে। খেয়াল করার প্রয়োজন রয়েছে। এর আরেকটি তাৎপর্য হলো, মানুষ মূল মালিক নয়। মূল মালিক আল্লাহপাক এবং সম্পদ (Resource) একটি আমানত মাত্র। যে কোনোভাবে সে সম্পদকে ব্যবহার করতে পারে না। সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে চেয়েছেন ঠিক সেভাবে। এগুলো হলো খিলাফতের ধারণার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য।

তৃতীয় ভিত্তি জাস্টিস, ইনসাফ বা ন্যায়বিচার। আদল হলো কুরআনের পরিভাষা। কুরআনে প্রায় একশ' আয়াত আছে, যেখানে জাস্টিসের কথা বলা হয়েছে। আরো একশ' আয়াত আছে যেখানে জুলুমের নিন্দা করা হয়েছে। তার মানে হলো, অর্থনীতিতে জুলুম থাকলে চলবে না এবং জাস্টিস আনতে হবে। এটিই হলো জাস্টিসের মূল তাৎপর্য।

আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায়, ইনসাফের দাবি হলো সকল মানুষের প্রয়োজনকে পূর্ণ করতে হবে। সকলের জন্য সম্মানজক আয়ের (Respectable Earning)

ব্যবস্থা করতে হবে। এমনভাবে অর্থনীতিকে সাজাতে হবে, এমনভাবে কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে যাতে সকলের আয়ের ব্যবস্থা হয়। যদি কারোর আয়ের ব্যবস্থা না হয় কিংবা যদি কেউ সম্মানজনক আয়ের ব্যবস্থা না করতে পারেন অর্থাৎ যদি তার কোনোরকম শারীরিক বা মানসিক দুর্বলতা থাকে বা অর্থনৈতিক কোনো বিপর্যস্ত অবস্থা থাকে সে অবস্থায় অনেকে হয়ত ইনকাম করতে পারলেন না; তাহলে তাদের ব্যবস্থা প্রথমে করতে হবে তার পরিবারের বা আত্মীয়-স্বজনদের। আর তারা যদি না পারেন তাহলে রাষ্ট্রকে করতে হবে। এ হলো জাস্টিসের দাবি।

এরপর ইসলামি অর্থনীতির কর্মকৌশল (Strategy) সম্পর্কে বলতে হয়। চারটি স্ট্র্যাটেজির কথা আমাদের অর্থনীতিবিদরা বলেছেন। অনেক কথা বললেও এই চারটি কথাই প্রধান। এর মধ্যে প্রথমটি হলো নৈতিক ছাঁকনি। অর্থাৎ রিসোর্সের একটি পয়েন্ট অব টাইম বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের একটি সীমা আছে এবং এর ডিমান্ড প্রায় সীমাহীন। ফলে এ দু'টির মধ্যে মিলাতে গেলে ডিমান্ডের উপর এমন এক ছাঁকনি দরকার যাতে ডিমান্ডগুলো যেন একটু কমে আসে, সংযত থাকে।

একটি ছাঁকনি হলো প্রাইস (Price) যেটি আধুনিক ক্যাপিটালিজমে আছে। প্রাইসের মাধ্যমে ডিমান্ডকে সংযত করা হয়। আমার টাকা কম সুতরাং আমি কিনতে পারবো না– এটা হচ্ছে এক ধরনের ছাঁকনি বা ফিল্টার, যার মাধ্যমে এটি হয়। ইসলাম এই প্রাইস ফিল্টারকে মেনে নিয়েছে। আবার মেনে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি জিনিস সে নিয়ে আসে। সেটিকে বলা হয় নৈতিক ফিল্টার। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ইসলাম এমন একটি নৈতিকতা সৃষ্টি করেছে, এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে যে, মানুষ যেন অপব্যয় না করে। অতিভোগ যেন না করে। অতিরিক্ত ভোগের দিকে যেন তার নজর না যায়। নৈতিক ছাঁকনির গুরুত্ব অনেক। কেন না, মূল্য ছাঁকনি (Price Filter) দ্বারা কেবল দরিদ্র মানুষের দাবি কমানো যায়। সুতরাং এই একটি স্ট্র্যাটেজি ইসলামি অর্থনীতিবিদরা সাজেস্ট করেছেন– মূল্য ছাঁকনি ছাড়াও কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে একটি নৈতিক ছাঁকনি (Moral Filter) নিয়ে আসা। যাতে করে ডিমান্ড সংযত হয়। প্রাইসের মাধ্যমেও আমরা ডিমান্ডকে সংযত করব, অন্যদিকে নৈতিক ছাঁকনির মাধ্যমে আমরা অতিরিক্ত ভোগ নিয়ন্ত্রণ করব। যত বেশি ভোগ করব, তত বেশি আল্লাহর কাছে দায়ী হব। আমাদেরকে জবাব দিতে হবে। এর জন্য চ্যারিটি করতে হবে। এইসব মাধ্যম ডিমান্ডের দাবিকে কমিয়ে এনেছে যেন আমাদের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের রিসোর্সের প্রাপ্যতার সঙ্গে ডিমান্ডের সংঘাতটা কমে আসে।

ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ দ্বিতীয় যে স্ট্র্যাটেজির কথা বলছেন সেটি হলো প্রপার মোটিভেশন (Proper motivation)। আমাদের প্রপার মোটিভেশন থাকতে হবে, প্রপার মোটিভেশন সৃষ্টি করতে হবে। ক্যাপিটালিজম এই মোটিভেশনকে একমাত্র স্বার্থ বলেছে। কিন্তু ইসলাম বলেছে– না, স্বার্থ ঠিকই আছে কিন্তু এই স্বার্থপরতাকে বিস্তার করে দিতে হবে। অর্থাৎ ক্যাপিটালিজম যেখানে দুনিয়াভিত্তিক স্বার্থের কথা বলে সেখানে ইসলামি অর্থনীতি দুনিয়া ও আখিরাতের স্বার্থের কথা বলে। দুটো মিলে যাতে লাভ সেটিই স্বার্থ। এডুকেশনের মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে, প্রচারের

মাধ্যমে, ওয়াজের মাধ্যমে, দাওয়াতের মাধ্যমে– সর্ব উপায়ে এটি করতে হবে। জনগণের মাঝে উপযুক্ত মোটিভেশন সৃষ্টি করতে হবে। অর্থনৈতিক কাজকর্মে কেবল দুনিয়ার স্বার্থ দেখলে চলবে না। দুনিয়ার স্বার্থ এবং আখিরাতের স্বার্থ দেখতে হবে। সুতরাং ইসলাম মোটিভেশনের স্বার্থপরতাকে বিস্তৃত করে দিয়েছে। বেসিক কর্মকৌশলের মধ্যে এটি রয়েছে।

উপরের বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সময় লাগবে। এ জন্য ইসলামি অর্থনীতিবিদরা তৃতীয় কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছেন Socio-economic financial re-structuring নামে এবং এই বিষয়টিকেই তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। এর মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ফিনান্সিয়াল ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হবে। এর সাহায্যে ব্যাংকিং সিস্টেমের মনিটরিং পলিসি (Monitoring ploicy) এবং ফিসকেল সিস্টেমে (Fiscal) পরিবর্তন করতে হবে। ব্যাংকের টাকা সৃষ্টির ক্ষমতাকে (Power to money creation) সংযত করতে হবে। পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে ও মিডিয়াম শিল্পের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষি এবং রুরাল অর্থনীতির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শুধুমাত্র আরবান বেজড (Urban Based) হলে চলবে না। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ইসলামি অর্থনীতিবিদরা করেছেন।

কর্মকৌশলের চতুর্থ দিক হলো, Social re-structuring, Economic re-structuring এবং Financial re-structuring-এর কাজটি করতে হবে সরকারকে। ইসলামের অবস্থা সমাজতন্ত্রের মতো নয় যে সরকার সব করবে। আবার পুঁজিবাদের মতোও নয় যে মার্কেটই সব করবে। ইসলাম বলে, মার্কেটকে আশি ভাগ আর সরকারকে বিশ ভাগ করতে হবে (এ হার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন হতে পারে)। এটিই হচ্ছে সরকারের ভূমিকা।

আর এই চারটিই হলো ইসলামি অর্থনীতির মূল কর্মকৌশল।

গ্রন্থসূত্র

১. আল-কুরআনুল করিম
২. বুখারী ও মুসলিম
৩. ড. এম. ওমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, বিআইআইটি
৪. শাহ আবদুল হান্নান, ইসলামি অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা
৫. Duraut, The Story of Civilizaiton
৬. Arnold Toynbee, A Study of History
৭. Paul A Samuelson, Economics
৮. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম
৯. ইমাম শাতিবি, আল-মুয়াফাকাত ফিল উসূল আল-শরিয়হ

পুঁজিবাদের অমানবিকতা ও ইসলামি অর্থনীতি

পুঁজিবাদ বিশ্বের সর্বাধিক চালু অর্থনীতি। ফরাসি বিপ্লবের আগে ও পরে মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের নেতাদের হাতে এর বিকাশ হয়। তারা ছিলেন মূলত নাস্তিক। ফলে পুঁজিবাদ সম্পূর্ণ সেকুলার ও অনৈতিক ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে। এরই ফলে পুঁজিবাদের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় কয়েকটি অমানবিক ও সুবিচারবিরোধী তত্ত্ব বা থিওরি।

প্রথমত, তারা বলেন যে অর্থনৈতিক আইন হচ্ছে প্রাকৃতিক আইনের মতো (Economic laws are like natural laws)। সুতরাং অর্থনীতিকে নিজের গতিতে চলতে দিতে হবে। বাজার ব্যবস্থায় বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এর অর্থ হচ্ছে অবিচার বন্ধ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, তারা বলেন যে মানুষ আর্থিক স্বার্থ (Pecuniary Interest) ছাড়া কোনো কাজ করে না। এ তত্ত্ব মানুষকে অমানুষ বানায়। এর অর্থ হচ্ছে এ কথা বলা যে, মানুষকে নিঃস্বার্থ কাজ করার কথা বলা অর্থহীন। তৃতীয়ত, তারা বলেন যে অর্থনীতিকেও ডারউইনের তত্ত্ব 'যোগ্যরাই টিকবে' (Survival of the fittest) এ ভিত্তি মেনে চলতে হবে। একে বলে সামাজিক ডারউইনবাদ (Social Darwinism)। অর্থাৎ অযোগ্যরা টিকবে না। তাতে কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। এটিই প্রাকৃতিক আইন। এরই ফলে অসংখ্য ছোট ফার্ম ধ্বংস হয়ে সারা বিশ্বের ৯০ শতাংশ সম্পদ ১০০ করপোরেশনের হাতে চলে গেছে। সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং এ কাজে সুদ পুঁজিবাদকে সাহায্য করেছে। সুদের প্রকৃতিই হচ্ছে সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ। চতুর্থত, পুঁজিবাদী তাত্ত্বিকেরা বলেন যে, অর্থনীতি একটি পজিটিভ বিজ্ঞান (Positive Science)। এখানে মূল্যবোধ থাকার কোনো সুযোগ নেই। মূল্যবোধ টেনে আনলে অর্থনীতি স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলবে। অর্থাৎ পুঁজিবাদ হচ্ছে মূল্যবোধহীন অর্থনীতির প্রবক্তা।

পুঁজিবাদের ফলে গত ২০০ বছর কী হয়েছে? এক দিকে ইউরোপ ও আমেরিকার কিছু দেশ এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো লুট করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশীয় পুঁজিবাদ দেশের জনগণকে শোষণ করেছে। পুঁজিবাদ দারিদ্র্য দূর করতে পারে নি। জনগণের মধ্যে বৈষম্য ভয়াবহ। এমনকি ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে সব সম্পদ কিছু ধনীর হাতে, যেমন করপোরেশনগুলো, ব্যাংক, শেয়ারের মালিক। সাধারণ নাগরিকেরা বেতন দিয়ে জীবন ধারণ করেন, তাদের বলতে গেলে সঞ্চয় নেই। ক্রেডিট কার্ডে চলে। বেকারও অনেক। তাদের অবস্থা কাহিল।

পুঁজিবাদকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই। সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের অদক্ষতা ও নীতিহীনতার জন্য (তারাও তত্ত্বে নাস্তিক, সেকুলার) যেহেতু ধনীরাই রাষ্ট্র ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারে না।

বিশ্বে বর্তমানে একমাত্র ইসলামই একটি নীতিবাদী অর্থনীতির প্রবক্তা। ইসলামে বিশ্বাসী লোকেরাই ইসলামি অর্থনীতি ও ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ওপর সাহিত্য তৈরি করেছেন। কিছু সুদহীন ব্যাংক চালু করেছেন। অন্য কোনো ধর্ম তা করে নি। ইসলামি অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে নৈতিকতা, আল্লাহতে বিশ্বাস, মানুষকে আল্লাহর খলিফা মনে করা এবং সর্বোপরি সুবিচারে বিশ্বাস।

ইসলামী অর্থনীতিতে বাজার থাকবে, তবে তা নিরঙ্কুশ (Absolute) হবে না। সরকার সেখানে সুবিচারের প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করবে। একে ইসলামে হিসবা (Supervision) বলা হয়। ইসলামি অর্থনীতিতে মনোপলি ভেঙে ফেলা হবে, প্রয়োজনে জাতীয়করণ করা হবে, প্রয়োজনে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে, লাভ নিয়ন্ত্রণ করা হবে, হারাম পণ্য উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হবে, ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হবে।

তেমনিভাবে রাজস্ব নীতিতে (Fiscal Policy) ব্যাপক পরিবর্তন করা হবে, বিশেষ করে ব্যয় নীতিতে (Expenditure Policy)। সরকার যদি চায় তবে বিচার সহজ করার জন্য কোর্ট ফি তুলে দিতে পারে (যেমন মুসলিম আমলে ছিল) এবং সেটি চালানোর খরচ সরকার তার রাজস্ব থেকে বহন করবে (যেমন প্রাইমারি শিক্ষার ক্ষেত্রে করা হয়)। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিচারালয়ে যাওয়া সহজ হবে। তেমনিভাবে মুসলিম আমলের মতো যারা পারেন না তাদেরকে উকিলের মাধ্যম ছাড়া কোর্টে সরাসরি দরখাস্ত করার এবং বিচার চাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

মুদ্রানীতিতে (Monetary Policy) বর্তমানের চেয়ে আরো ভালো করা সম্ভব। ড. উমর চাপড়া তার Towards a Just Monetary Policy শীর্ষক লেখায় বলেছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে টাকা ছাপে (যাতে খরচ অতি সামান্য) তা সরকারকে বিনা সুদে দিতে হবে (জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য) এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে দিতে হবে মুদারাবার ভিত্তিতে (লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব পদ্ধতিতে)। এ টাকা যেহেতু 'ফাও' টাকার মতো, তাই লাভ কম হলেও বা না হলেও কোনো ক্ষতি হবে না। তেমনিভাবে তিনি বলেন যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে টাকা বানায় (অর্থাৎ ব্যাংক যেভাবে Deposit Creation-এর মাধ্যমে জমা টাকাকে কয়েকগুণ বানিয়ে ফেলে) তার মালিকানা জনগণের ধরতে হবে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক সে টাকা ব্যবহার করে যে লাভ করবে তার অংশ (ধরুন লাভের ৬০ শতাংশ) সরকারি ট্রেজারিতে জমা দিতে হবে। অর্থাৎ জনগণকে দেয়া হবে।

ইসলামি অর্থনীতিতে সব সেক্টরই গুণগতভাবে পরিবর্তিত হবে (ব্যাংক ব্যবস্থা, স্টক মার্কেট, ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থা ইত্যাদি)। এর ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে যাবে, দারিদ্র্য দূর হবে, জাকাতের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান হবে। অমুসলিমদের নিরাপত্তার জন্য জাকাতের পরিবর্তে অন্য রাজস্ব ব্যবহার করা হবে।

সর্বশেষে বলতে চাই, পুঁজিবাদের অমানবিকতার সমাধান সবখানে, অন্তত মুসলিম বিশ্বে ইসলামি অর্থনীতি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমি ড. উমর চাপড়ার 'ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ' এবং 'অর্থনীতির ভবিষ্যৎ' বই দুটি পড়ার অনুরোধ করছি।

শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ গঠন

মুসলিম উম্মাহর অবস্থা আজ খুব ভালো নয় তা সকলেই জানেন। এখন পর্যন্ত আদর্শিক দিক দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে উম্মাহর অবস্থান এবং ইসলাম সম্পর্কে অনেক অজ্ঞতা রয়েছে। এখানে বিদ'আত প্রচলিত আছে। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ জায়গায় শিরক প্রবেশ করেছে।

সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহ গভীর অজ্ঞতা, অনেক বিদ'আত এবং শিরকে ডুবে আছে। বস্তুগতভাবে বললে অধিকাংশ মুসলিম দেশেই অশিক্ষা ও দারিদ্র্যতা বিরাজমান। এছাড়া উন্নয়নের দিক থেকেও তারা অনেক পিছনে রয়েছে। কিছু দেশ ছাড়া মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অর্থনীতি খুব খারাপ, তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও খুব দুর্বল।

মুসলিম বিশ্বের আদর্শিক অবস্থা, তাদের বস্তুগত অবস্থা যখন এই– তখন একটি শক্তিশালী উম্মাহ গঠন করতে তাদের কী করা উচিত? একটি শক্তিশালী উম্মাহ গড়ে তুলতে অবশ্যই তাদেরকে শিক্ষা, অর্থনীতি এবং প্রতিরক্ষাকে গড়তে হবে। আদর্শিক বিষয় দেখার পূর্বে এগুলো হলো অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা সবাই অবগত। সব দেশেই নয়, অধিকাংশ দেশেই ইসলামিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণ হচ্ছে না। আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি– আমার স্কুল থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত আমাকে কুরআনের বিশটি আয়াতও শিখানো হয় নি। আমি দশটি আয়াতও শিখি নি। আমি শিখি নি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী– যিনি আমাদের আদর্শ। তাহলে কি এ শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষা আমাদের চাহিদা পূরণ করছে?

এটি পূরণ করছে না। স্বাধীন মুসলিম দেশসমূহের শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী শিক্ষাব্যবস্থা গড়াই লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমি জানি, এটি সময়ের ব্যাপার এবং এখানে আল্লাহর বিধান এবং অন্যান্য অনেক বিষয় জড়িত। তাই সময় প্রয়োজন। কিন্তু উদ্দেশ্য পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, আমাদের এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা অর্জন করতে হবে যেটি আমাদের সকল বস্তুগত চাহিদা পূরণ করবে, সভ্য-সুন্দর মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার সকল চাহিদা পূরণ করবে। একই সাথে এটি আমাদের ইসলামিক প্রয়োজন মিটাবে– যদিও বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই এ লাইনে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। কিন্তু উম্মাহর কাছে উদ্দেশ্য পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বৈষয়িক অগ্রসরতার জন্য, আমাদের দ্বীন-ধর্মের অগ্রসরতার জন্য, আদর্শিক উন্নতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষা। যদি চলমান শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন পূরণ না করতে পারে তখন আমাদের দায়িত্ব হবে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন করা এবং ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানা। ব্যক্তিগত পড়াশুনার কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের অনেক কিছু করার আছে। এজন্য সকল মুসলিম সরকার, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীদের অবশ্যই কাজ করতে হবে। সকল মুসলিম অর্থনীতিবিদদের শক্তিশালী মুসলিম অর্থব্যবস্থার জন্য কাজ করতে হবে। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের সীমান্ত পাহারা দিতে বলেছেন। মুসলিম উম্মাহর প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে, মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে আমরা উদাসীন হতে পারি না। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ভালো। কিন্তু এটি শুধু মুসলিমদের জন্যই নয়, সবার জন্য হতে হবে। অন্যরা যেখানে সশস্ত্র সেখানে আমরা মুসলিম বিশ্বকে নিরস্ত্র হতে বলতে পারি না।

যোগ্য উম্মাহ গড়ার কথা বলছিলাম। বস্তুগত বিভিন্ন দিকের মধ্যে কিছু বিষয়ের আলোচনা করেছি। সত্যিকার অর্থে আমাদের এ বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে যে উম্মাহ নিজেই আগ্রাসনের শিকার, হুমকির সম্মুখীন। আজ আমরা জানি যে, অনেক পণ্ডিত সভ্যতার দ্বন্দ্ব (Clash of Civilization) সম্বন্ধে কথা বলছেন। আমেরিকার একজন প্রধান পণ্ডিত হান্টিংটন সভ্যতার দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কথা বলেছেন এবং তিনি বলেছেন, 'পশ্চিমাদের কাছে ইসলামই পরবর্তী হুমকি। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে এর বিরুদ্ধে যে কোনো হুমকির অবসান ঘটাতে হবে।' যেন এটিই সভ্যতার সর্বোচ্চ সীমা, যেন এটিই শেষ কথা। আমরা পশ্চিমা সভ্যতাকে শেষ হিসেবে গ্রহণ করি না। শুধু হান্টিংটন নন, ফুকুয়ামা তার বই The End of History (ইতিহাসের সমাপ্তি)-তে বলেছেন যে, ইতিহাস তার শেষ গন্তব্যে পৌঁছেছে। তিনি বোঝাচ্ছেন, সত্যিকার অর্থে সেকুলার গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ হলো শেষ দৃষ্টিভঙ্গি, যেটি মানব সভ্যতা অর্জন করেছে। তাই কোনো নতুন কিছু আসবে না, কোনো ভালো কিছু আসবে না। এটিই ইতিহাসের সমাপ্তি। কিন্তু আমরা সেকুলারিজমকে শেষ অধ্যায় হিসেবে ধরে নিতে পারি না।

মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, তারা আল্লাহর বিধানকে ভুলে গেছে এবং এটিই সমস্ত অনৈতিকতার মূল কারণ। আমরা পৃথিবীতে যা দেখি তাতে অধিকাংশ যুদ্ধ জাতিগতভাবেই হচ্ছে। আমি একমত পোষণ করি যে, ধর্মের ভিত্তিতেও যুদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে, আমরা যদি তা পছন্দ করি তবে ধর্মের ভিত্তিতে সংঘাত বন্ধ করতে পারি। সেকুলারিজমের কাছে আমরা নৈতিকতাকে ছেড়ে দিতে পারি না, আত্মসমর্পণ করতে পারি না, যা আল্লাহর বিধানকে ভুলিয়ে দেয়।

পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব ও পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ

মুসলিম জাতির কাছে পাশ্চাত্য চ্যালেঞ্জ হলো রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সবচেয়ে বেশি এবং মৌলিক হলো বুদ্ধিবৃত্তিক। আমি মুসলিম জাতির রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে বেশি বলা প্রয়োজন মনে করি না। পশ্চিমারা কী চায়? পশ্চিমারা চায় মুসলিম দেশসমূহ পশ্চিমাদের নির্দেশগুলো মেনে চলুক। এটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

যখন একটি মুসলিম দেশ আণবিক বোমা বিস্ফোরণ করতে যায় তখন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ শক্তির প্রেসিডেন্টের টেলিফোনে নির্দেশ পায় যে, 'তুমি এটি করতে পারো না।' মুসলিম দেশসমূহের ব্যাপারে অনেক বেশি নাক গলানো হয়। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদেরকে তাদের নির্দেশসমূহ মানাতে চায়। যদি আমরা তাদের আদেশ মেনেও নিই– তারা কখনো মুসলমানদের ভালোর জন্য এবং ইসলামের ভালোর জন্য কোনো নির্দেশ দিবে না। আমি বলি না অন্যের ভালো বিষয়গুলো শুনবো না। আমাদের অন্যের ভালো জিনিসকে শোনা উচিত। কিন্তু আমরা পশ্চিমাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে মেনে নিতে পারি না। তারা আমাদেরকে তাদের সংস্কৃতির কাছে নত হতে বলে– যেটা সবচেয়ে অশোভন, অশ্লীলতাপূর্ণ ও মানবদেহ প্রদর্শনে ভর্তি। পশ্চিমা ভোগবাদী সংস্কৃতিতে নারীদেরকে নোংরাভাবে ব্যবহার করা হয় এবং পুরুষদের লালসার বস্তুতে পরিণত করা হয়। আমি জানি না মানব ইতিহাসে এরকম বাজে সামাজিক ব্যবস্থা ছিল কি না? তাদের পারিবারিক জীবন কমবেশি তিক্তকর, তাদের মাতা-পিতা অবহেলিত আর না আছে তাদের শিশুদেরও নিরাপত্তা। সত্যিকার অর্থে মাতা-পিতা তাদের সমাজে অবহেলিত এবং নিরাপত্তাহীন। বৃদ্ধ বয়সে তাদের প্রচুর সমস্যা হয়। তাদের ছেলেমেয়েরা মাতা-পিতা দুজনের যত্ন পায় না। সম্ভবত তারা অধিকাংশই একজনের অর্থাৎ মাতার যত্ন পায়। অথচ আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে শিশুদের মাতা-পিতা দুজনেরই যত্ন পাওয়া উচিত। তারা কোনো কারণ ছাড়াই অথবা অর্থহীন কারণেই তাদের পরিবার ধ্বংস করে দেয়। বিবাহ ঐতিহাসিকভাবেই সুন্দর ব্যবস্থা। এটি পুরুষ বা মহিলা কারোর জন্যই ক্ষতিকর নয়। তারা এমন এক অবস্থায় এসেছে সেখানে সত্যিই পরিবার ধ্বংস হচ্ছে। তারা অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলতায় পরিচালিত হচ্ছে।

অর্থনীতির দিকে আসা যাক। তাদের সত্যিকার লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদ। তারা আমাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির, তৃতীয় শ্রেণির, চতুর্থ শ্রেণির দেখতে চায়। তারা আমাদেরকে তাদের বাজার বানাতে চায়। তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধান পশ্চিমা শক্তির আনুকূল্যে পরিচালিত। আমি তাদেরকে ভালোভাবে জানি। তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আমার ভালোভাবে জানা আছে। তারা বেশিরভাগই সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে কাজ না করে পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে। কিন্তু আমি অবশ্যই বলবো, আসল হুমকি হলো বুদ্ধিবৃত্তিক। অন্যান্য চ্যালেঞ্জও সেখানে আছে; কিন্তু মূল এবং গূঢ় মৌলিক চ্যালেঞ্জ যেটি পশ্চিমাদের থেকে আসছে সেটি সত্যিকার অর্থেই বুদ্ধিবৃত্তিক। তারা অভিযুক্ত করছে এবং আমাদের বলছে যে, ইসলামিক রাষ্ট্রের ধারণা সম্ভবপর নয়। ইসলামিক রাষ্ট্র হওয়া ভালো নয়। তারা বলছে যে ইসলাম মানবাধিকার দেয় না। তারা বলছে যে, ইসলাম নারীর অধিকার দেয় না। আমি অবশ্যই দুঃখের সাথে বলবো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু মুসলমানদের কর্মকাণ্ডে এটি প্রকাশ পায় যে, ইসলাম যেন মানুষের অধিকার এবং নারীর অধিকার দেয় না। কোনো কোনো দেশের কোথাও কোথাও এর কিছু প্রকাশ আছে, যা এ ধারণার জন্ম দেয়। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের তা করা উচিত নয়। আমাদের ইসলামের সুনাম ক্ষুণ্ন করা উচিত নয়।

মানবাধিকার এবং নারীর অধিকার ইসলামে খুবই গ্রহণযোগ্য। এর সমর্থনে আমি তিনটি মূল প্রমাণ উল্লেখ করবো। ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের সংবিধান উলামা দ্বারা প্রণীত। ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের সংবিধান যদিও উলামা দ্বারা তৈরি নয় তথাপি সকল দলের উলামা দ্বারা গ্রহণীয়। এ দুই প্রমাণ এবং ইসলামের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের লেখাগুলো যেমন– মুহাম্মদ আসাদ, আবুল আলা মওদূদী, হাসান তুরাবি, বাংলাদেশের একজন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ মরহুম আব্দুর রহীমসহ এরকম অনেকের লেখাগুলো। তাই আমি বলতে পারি, এসব দলিল যেগুলো উলামাদের দ্বারা প্রণীত অথবা তাদের দ্বারা সমর্থিত– পরিষ্কার প্রমাণ করে যে, ইসলাম মানবাধিকার দিয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ওপর একটি অধ্যায় আছে। ইরানের সংবিধানেও জনগণের স্বাধীনতার ওপর অধ্যায় আছে।

তুলনামূলক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি আমার ছাত্রদের ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আমেরিকার সংবিধান পড়িয়েছি। তাই আমি বলতে পারি যে, মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের লেখা, গুরুত্বপূর্ণ আলেমদের লেখা এবং ইরান ও পাকিস্তানের দুই সংবিধান প্রমাণ করে এবং পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং নারীর অধিকারের প্রতি মর্যাদাশীল। এ ব্যাপারে মানবাধিকার সম্পর্কে OIC Declaration যেটি OIC ফিকাহ একাডেমি কর্তৃক অনুমোদিত তাও দেখা যেতে পারে।

(১৯৯৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের শেফিল্ডে প্রদত্ত বক্তৃতা হতে)

কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলাধীন কুড়িখাই গ্রামের ঐতিহ্যবাহী শাহ পরিবারের সদস্য শাহ আবদুল হান্নান ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ১ম স্থানসহ মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। এ সময়ে তিনি Muslim News International, Karachi, Pakistan-এর ঢাকা করেসপন্ডেন্ট ছিলেন।

কর্মজীবনে অধ্যাপনা দিয়ে শুরু করে কিছুদিন পর ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। অর্থ বিভাগ থেকে শুরু করে তিনি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন বিভাগের কালেক্টর, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য ও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্পূর্ণ নতুন করে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বর্তমান অবস্থান পর্যন্ত আনতে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পর তিনি এর প্রথম দ্বিতীয় সচিব হিসেবে যোগ দেন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এর প্রথম সচিবের দায়িত্ব পান। এদেশে যুগান্তকারী মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা তাঁর হাত দিয়েই প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে তিনি ১৯৯৭ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এর আগে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৯৫ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের, ১৯৯৬ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগের এবং ১৯৯৭ সালে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের সচিব পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান হিসেবে চার বছর দায়িত্ব পালন করেন। এদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি একজন স্বপ্নদ্রষ্টা।

তিনি কিছুদিন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ও দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর উপদেষ্টা। এছাড়াও তিনি মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি, দারুল ইহসান ট্রাস্ট, ইবনে সিনা ট্রাস্ট, Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), Islamic Economics Research Bureau, Central Shariah Board for Islamic Banks of Bangladesh, Islamic Banks Consultative Forum সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেরই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হলো Social Laws of Islam, Usul-al-Fiqh, দেশ সমাজ রাজনীতি, Law Economics and History, বিশ্ব পরিস্থিতি অর্থনীতি ও ইসলাম বিষয়ক বিশ্লেষণ, আমার কাল আমার চিন্তা, অষ্টম কলাম, সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি ভাবনা, বিষয়চিন্তা, My Essays on Socio Political and Islamic Issues, Selected Essays on Islam Politics Economics and Contemporary Issues, Islam and Gender: The Bangladesh Perspective, ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল, নারী ইসলাম ও বাস্তবতা ইত্যাদি।